স্মরণ পুস্তিকা

প্রথম কঠিন চীবর দান - '৯৮

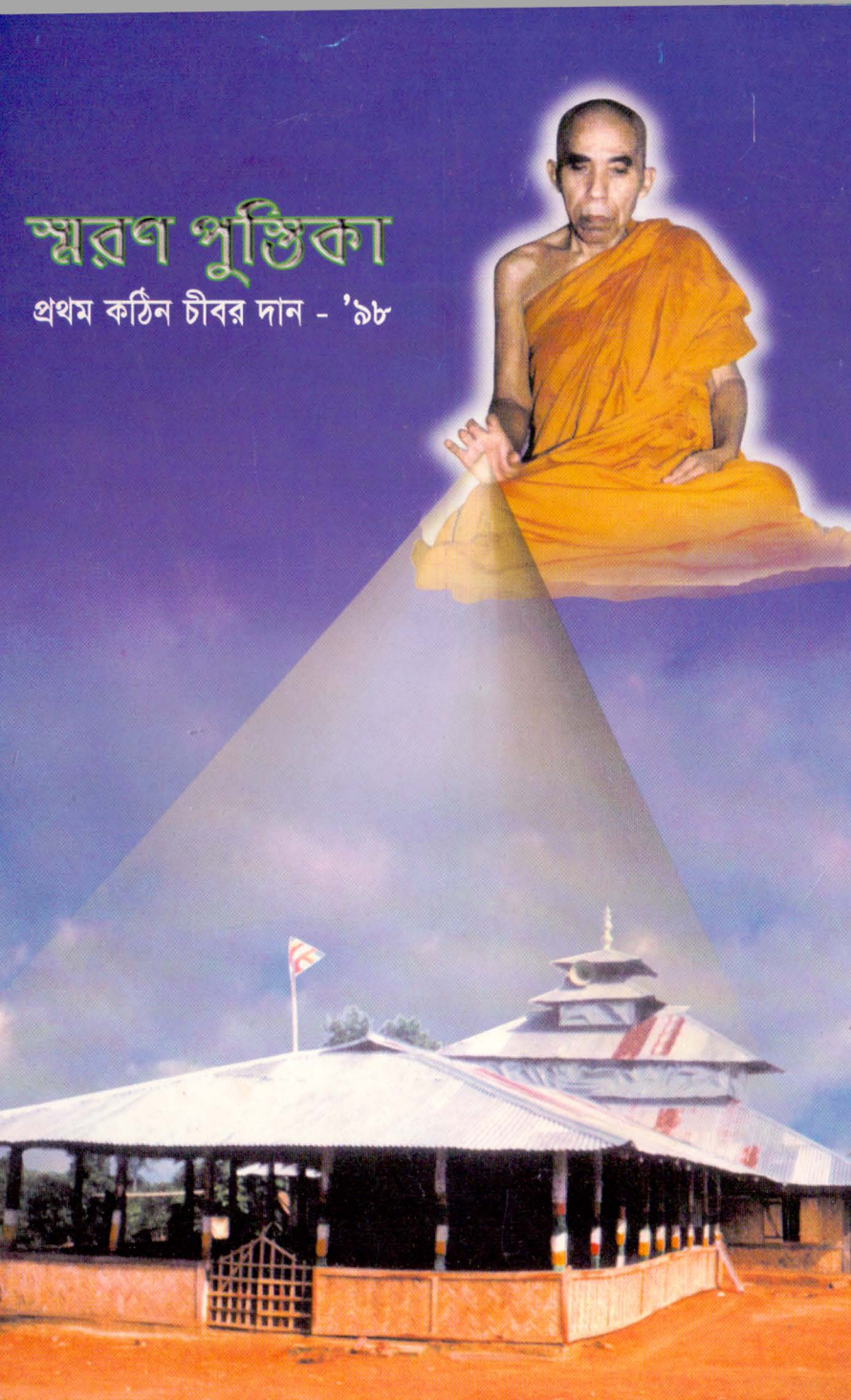

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhante

স্মরন পুস্তিকা-১

প্রথম কঠিন চীবর দান - '৯৮
বুদ্ধাব্দ ২৫৪২, বাংলা ১৪০৫
কঠিন চীবর দানোৎসব ঃ ২৭ ও ২৮শে অক্টোবর '৯৮

প্রকাশনায়
নানিয়ার চর রত্নাংকুর বনবিহার
নানিয়ার চর, রাঙ্গামাটি।

প্রকাশ কাল
অক্টোবর ১৯৯৮ ইং,

সম্পাদনা পরিষদ
আনন্দ প্রকাশ চাকমা *-প্রধান সম্পাদক*
রূপায়ন চাকমা
বিমল চাকমা
রূপায়ন বড়ুয়া

সার্বিক সহযোগিতায়
শ্রীমৎ জিন প্রিয় ভিক্ষু

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
শ্রীমৎ জিন প্রিয় ভিক্ষু
আনন্দ প্রকাশ চাকমা

মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
রূপায়ন চাকমা

অলঙ্করণ
সমরজিৎ সাহা (তুহিন)

বর্ণবিন্যাস
কম্পিউসার্ভ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩০৮৪৫

প্রোডাকশন
জেরিকো
৫২৮, কদম মোবারক লেন, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।

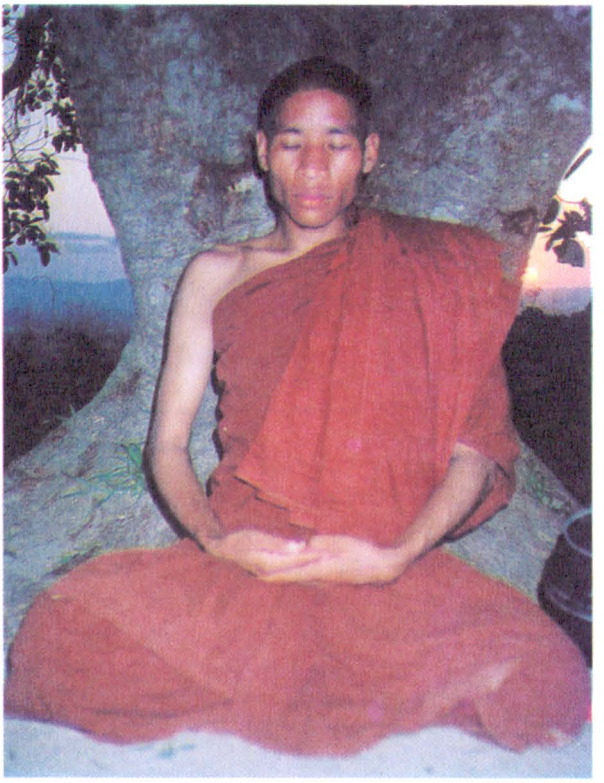

অরণ্যচারী ভিক্ষু শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ যাঁর অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনায় ধর্মীয় তীর্থ পীঠ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নানিয়ার চর রত্নাংকুর বন বিহার।

জন্ম	ঃ	জানুয়ারী প্রথম সপ্তাহ ১৯৬৮ ইং
গৃহীনাম	ঃ	রঞ্জিত কুমার চাকমা
পিতা	ঃ	ধাবা ধন মহাজন (তুঙ)
মাতা	ঃ	স্বর্ণলতা চাকমা
গৃহী নিবাস	ঃ	বড় হাড়ি কাটা, লংগদু।
প্রব্রজ্যা গ্রহণ	ঃ	আগষ্ট, ১৯৮৯ ইং।
বনভান্তের শাসনে প্রবেশ	ঃ	সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ ইং।
উপসম্পদা গ্রহণ	ঃ	১৫ এপ্রিল, ১৯৯০ ইং, ১লা বৈশাখ ১৩৯৭ বাংলা।

১৯৯৮ ইং সনে নানিয়ার চর রত্নাংকুর বন বিহার ও তার অন্তর্ভুক্ত অরণ্য কুটিরে বর্ষাবাস যাপনকারী ভিক্ষু ও শ্রামনদের তালিকা ঃ

নানিয়ার চর রত্নাংকুর বন বিহার অরণ্য কুটিরে ঃ

১। শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ ভিক্ষু — ৯ বর্ষা

২। শ্রীমৎ জ্ঞান বর্দ্ধন ভিক্ষু — ৮ বর্ষা

নানিয়ার চর রত্নাংকুর বন বিহারে আবাসিক ভিক্ষু ঃ

১। শ্রীমৎ জিন প্রিয় ভিক্ষু — ৭ বর্ষা

২। শ্রীমৎ চুল কাল ভিক্ষু — ৪ বর্ষা

৩। শ্রীমৎ মঙ্গল জ্যোতি ভিক্ষু — ১ বর্ষা

৪। শ্রীমৎ করুণা বর্দ্ধন ভিক্ষু — ১ বর্ষা

৫। শ্রীমৎ মহামিত্র ভিক্ষু — ১ বর্ষা

৬। শ্রীমৎ ধর্মদীপ ভিক্ষু — ১ বর্ষা

শ্রামন ঃ

১। শ্রীমান রত্নাংকুর শ্রামনের

২। শ্রীমান রত্নজ্যোতি শ্রামনের

৩। শ্রীমান যোগানন্দ শ্রামনের

৪। শ্রীমান ক্ষেমপ্রিয় শ্রামনের

৫। শ্রীমান প্রিয়ময় শ্রামনের

৬। শ্রীমান রত্নময় শ্রামনের

বনভান্তের বাণী

চক্ষুদ্বারে কোন রূপ দর্শন করিয়া মনোজ্ঞ বিষয় বস্তু (আলম্বন) রূপে আসক্ত হওয়া উচিত নহে। অমনোজ্ঞরূপ দর্শন করিয়া ও তৎপ্রতি বিদ্বেষচিত্ত উৎপন্ন করা অনুচিত। যদি তৎতৎ দৃষ্টিরূপের প্রতি আসক্তি উৎপাদন না করিয়া স্মৃতি সহকারে তাহা নিরীক্ষণ করা হয়, তাহা হইলে মোহ উৎপন্ন হইতে পারিবে না। এইরূপ হইলে চক্ষুদ্বারে সংযম আসে, ইহাতে চক্ষুদ্বার আবদ্ধ ও সুরক্ষিত হয়। ঠিক তদ্রুপ ভাবেই শ্রোত্র দ্বারে শব্দ, ঘ্রান দ্বারে গন্ধ এবং জিহ্বা দ্বারে রস উৎপন্ন হইলে অকুশল বীথিতে (চিত্তের পাপ গতি) অশ্রদ্ধা, অধৈর্য্য, হীনবীর্য্যভাব, ভুল ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতা উৎপন্ন হয়। চক্ষু, শ্রোত্র প্রভৃতি সংযম হইলে কুশল বীথিতে (চিত্তের পূণ্য গতিতে) শ্রদ্ধা, ক্ষান্তি, বীর্য্য স্মৃতি ও জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রাণীহত্যা, চুরি ব্যভিচার না করিলে কায় সংযম হয়। মিথ্যা, পিশুন (ভেদবাক্য), কর্কশ বাক্য ও সম্প্রলাপ (বাজে গল্প) বাক্য ইত্যাদি ভাষণ না করিলে বাক্য সংযত হয় এবং অভিধ্যা (পরসম্পত্তি লোভ), ব্যাপাদ (হিংসা) ও ভ্রান্ত ধারণার অধীন না হইলে মন সংযত হয়। যাঁহার এই দশবিধ কর্ম পথে সম্যকরূপে সংবৃত্তি ঘটিয়াছে তিনি সমস্ত দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নির্বাণ উপলব্ধি করিয়া চিরশান্তির অধিকারী হন।

সাধনানন্দ মহাস্থবির
৩-১০-৯৬

(শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির)
বনভান্তে
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

বাণী

নানিয়ার চর রত্নাংকুর বন বিহার কর্তৃক "দানোত্তম কঠিন চীবর দান- '৯৮" উপলক্ষে "স্মরণ পুস্তিকা" প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। ভগবান বুদ্ধ ও আর্যপুরুষ "বনভান্তের" আশীর্বাদ পুষ্ট নানিয়ার চর রত্নাংকুর বন বিহার অত্র এলাকার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের নিকট একটি পরম পবিত্র স্থান। অত্র এলাকার সকল মানুষের মধ্যে শান্তির সুবাতাস যাতে প্রবাহিত হয় তার প্রচেষ্টায় এই বিহার অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। "কঠিন চীবর দান- '৯৮" অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ এলাকার আপামর জন সাধারণের ভবিষ্যৎ সুখ, সমৃদ্ধি ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠতে থাকবে- ইহাই এলাকাবাসীর প্রত্যাশা।

এলাকার সকল নর-নারীর মঙ্গল কামনা করি।

মোঃ ফজলুর রহমান
থানা নির্বাহী কর্মকর্তা
নানিয়ার চর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

কঠিন চীবর দান '৯৮ এর
উদ্বোধনী সংগীত

রচনা ও সুর ঃ আনন্দ প্রকাশ চাকমা
শিল্পী ঃ জিসা, রুখী ও সীমা

পূণ্য জাগাত পূণ্য হেনত
গোরির আমি কঠিন চীবর দান
বৌদ্ধ ধর্মত যিয়ান বেগর দাঙর দান
কঠিন চীবর দান॥

গুড়' বুড়' মিলা মরত
এ গত্তর উয়েই আমি কিয়োঙত
এগা মনে এগা চিত্তে
ইচ্ছা আমি ধর্ম জাগানত
এয' এয' বেগে কুড়ে লোই আমি
মানে কুলর আযল গমান
কঠিন চীবর দান॥

সুদ' কাদি রং গোরি, কাবর বানেই বেইন বুনি,
পূণ্য দানর জিনিস পাদি, কল্পতরু দান গোরি।

পাপ তাপ ধোই ফেলেই
পূণ্য পধত হুচ বাড়েই
ধর্ম রঙে আমা মনানী
এয' বেগে দোলে সাজেই
বুদ্ধ ধর্ম সংঘ মনে প্রাণে জুবি
আমা ধর্মর বড় পূণ্যয়ান
কঠিন চীবর দান॥

সম্পাদকীয়

সভ্যতার ঊষালগ্নে অরণ্যচারী সেই অসহায় মানুষ আজ অসীম শক্তিধর। নিজের সমস্ত প্রাণশক্তি তিল তিল করে খাটিয়ে মানুষ রচনা করেছে সভ্যতার এই তিলোত্তমা মুর্তি। সুরম্য অট্টালিকায় আরাম কেদারায় বসে আত্ম গর্বে মানুষ আজ বিভোর। মানুষ তার সমস্ত চিন্তা শক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে শুধু আধুনিক ইমারত গড়ার কাজে, অন্যকে বশীভূত করে নিজের কর্তৃত্ব জাহির করার কাজে। কিন্তু তাতে করে কি মানব সমাজে শান্তির শীতল ছায়া নেমে আসছে ? আত্মিক প্রশান্তি কি মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারছে ? নদীর এপার ওপার সংযোগকারী বিশাল সেতু নির্মিত হলেও মানুষে মানুষে মৈত্রীর সেতু বন্ধন কি রচিত হচ্ছে ??? উত্তর নেতিবাচক! যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই উত্তর ইতিবাচক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত বিশ্ব শান্তি হতে পারে না। কারণ লৌকিক শান্তি মানুষের প্রকৃত শান্তি নয়। তা আজ আছে কাল নেই। সম্পূর্ণ অস্থায়ী। আত্মিক সুখই প্রকৃত সুখ যা স্থায়ী। আত্মিক সুখ লাভ করতে হলে উদ্দীপ্ত হতে হবে জগতের অহিংসা মন্ত্রে। নিজের চিত্তকে মৈত্রীর ভাব দ্বারা অবগাহন করাতে পারলে আপনিই রচিত হয়ে যায় শান্তির অমোঘ ঠিকানা। তাই চিত্ত সংযমের জন্য প্রয়োজন সদ্ধর্ম চর্চা।

ধর্মচর্চার অবিচ্ছেদ্য একটি বিষয় 'দান'। দুটি বর্ণের ছোট্ট একটি নাম এ 'দান'। কিন্তু এ দানের ফল এতই যে ব্যাপক তা তুলনা করা যায় না। দুঃখ কারো কাম্য নয়। এর থেকে পরিত্রাণ হচ্ছে মানুষের আজীবন ব্রত। কিন্তু দান বা সৎকর্ম সম্পাদন ছাড়া দুঃখমুক্তির পথ দুর্ভেদ্য। দানকে শুধু বস্তু ভিত্তিক মনে করলে তার সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক পর্যায়ে দানকে বিশ্লেষণ করলে তার পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক। যেমন বস্তু দান, বাক্য দান, শ্রম দান ..... ইত্যাদি। মোট কথা নিজ থেকে নিঃস্বর্তভাবে পরের উপকারের জন্য কিছু প্রদান করার নামই দান। অনেক অদ্ভুত দানীর মতে, একাগ্রচিত্তে এক পয়সা দানের যে ফল হাজার লক্ষ টাকা দানেরও সে ফল। সুতরাং দানের পরিমাণ বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন রেখেই প্রসঙ্গটি শেষ করতে চাই। "খুব বেশী সস্তা হলে এক পয়সায় এক পেয়ালা মুড়ি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সুখে বসবাসের জন্য এক পয়সায় একটা পাকা বাড়ী নির্মাণ করা যাবে কি ? বৌদ্ধ ধর্মের বিধানমতে, সর্বদানের সেরা দান কঠিন চীবর দান। স্বয়ং তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ বলেছিলেন, –"জগতে যত প্রকার বস্তু দান প্রচলিত আছে, সর্বাপেক্ষা কঠিন চীবর দানই শ্রেষ্ঠ, এই অগ্রশ্রেষ্ঠ বস্তু দানে সকল প্রকার পূণ্য লাভ হয়। ছোট বড় যত প্রকার দান আছে,

একখানা কঠিন চীবর দানের ফলের তুলনায় ঐ দান ষোলভাগের একভাগের ও সমান হয় না।" সুতরাং দানোত্তম কঠিন চীবর দান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট একটি খুবই উদ্দীপনাময়ী দানপর্ব। পৃথিবীর বিভিন্ন বৌদ্ধ রাষ্ট্রে অত্যন্ত ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে কঠিন চীবর দানোৎসব সম্পাদন করা হলেও মিগার মাতা বিশাখা প্রবর্তিত পদ্ধতিতে কোথাও দান সম্পন্ন হয় না বললেই চলে। একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারে আর্য পুরুষ শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাস্থবিরই (বনভান্তে) ঐতিহ্যবাহী পন্থায় এ কঠিন চীবর দান সুসম্পন্ন করে আসছেন। পরম শ্রদ্ধেয় বনভান্তের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বলেই নানিয়ার চর রত্নাংকুর বন বিহারে এই সর্বপ্রথম বিশাখা প্রবর্তিত পদ্ধতিতেই দানোত্তম কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শ্রদ্ধেয় বনভান্তের আবির্ভাব না ঘটলে এখানে এরকম মহৎ পূণ্যক্ষেত্র নিশ্চয়ই গড়ে উঠতো না। ১৯৯৭ইং সনের শেষার্ধে স্থাপিত হওয়ার পর এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ১৯৯৮ইং সনের এই কঠিন চীবর দানই হচ্ছে নানিয়ার চর রত্নাংকুর বন বিহারের ইতিহাসে সর্বপ্রথম উদ্‌যাপিত কঠিন চীবর দান। তদুপলক্ষে এই স্মরণ পুস্তিকাটিই আমাদের প্রথম সংকলিত প্রকাশনা। যাঁদের আর্থিক আনুকুল্যে এই মহৎ উদ্যোগ সফলকাম হয়েছে তাঁদের কাছে প্রকাশ করছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। দায়ক-দায়িকা, নবীন-প্রবীন, লেখক-লেখিকাদের কাছ থেকে অনেক লেখা আমরা পেয়েছি। কিন্তু বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে স্মরণ পুস্তিকার কলেবর বর্ধিত করতে না পারায় সকলের লেখা প্রকাশে সম্ভব হয়ে উঠলো না বলে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি। সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান সত্ত্বেও সংকলনে অনেক ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। আমাদের সেই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য সুহৃদ বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। সংকলন প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা ও সৎ পরামর্শ প্রদানের জন্য আমরা শ্রীমৎ জিনপ্রিয় ভিক্ষুর চরণ কমলে বিনম্র কৃতজ্ঞ।

কম্পোজ ও মুদ্রণের ব্যয় নির্বাহের জন্য সংকলনের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সুধী পাঠক সমাজ বিষয়টি অনুধাবন করে মুল্য নিয়ে তেমন কোন প্রশ্ন তুলবেন না বলে আমাদের প্রত্যাশা।

পরিশেষে সদ্ধর্মের হোক বিজয়, বুদ্ধ শাসন হোক সুপ্রতিষ্ঠিত, এই মহতী কঠিন চীবর দানের ফলে মঙ্গল হোক সকলের, সকল বিপত্তি হোক দূরীভূত, শ্রদ্ধেয় বনভান্তের করুণাশীর্বাদ হোক আমাদের জীবন পাথেয়- এই কামনায়।

"সব্বে সত্ত্বা সুখীতা ভবন্তু।"

আনন্দ প্রকাশ চাকমা
প্রধান সম্পাদক

সূচী চিত্র

প্রবন্ধ

১। প্রসঙ্গঃ নানিয়ার চর রত্নাংকুর বন বিহার	হৃদয় রঞ্জন চাকমা ও প্রভাত কুসুম চাকমা	১২
২। ধর্ম বন্ধন–	ভিক্ষু শ্রীমৎ জে, প্রজ্ঞাবংশ	১৭
৩। দান-শীল ভাবনার তাৎপর্য্য–	শ্রীমৎ জিন প্রিয় ভিক্ষু	২০
৪। বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম এবং বনভান্তে–	আনন্দ প্রকাশ চাকমা	২৫
৫। বৌদ্ধ ধর্মে শ্রদ্ধা–	শ্রীমৎ ইন্দ্র গুপ্ত ভিক্ষু	২৮
৬। সদ্ধর্ম অনুসন্ধানে দুঃখ মুক্তি–	শ্রীমৎ দেবানন্দ ভিক্ষু	৩১
৭। দুর্লভ মানব জীবনে প্রব্রজ্যা–	শ্রীমৎ পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু	৩৫
৮। বৌদ্ধ ধর্ম কি এবং কেন–	শ্রীমৎ ব্রহ্ম দত্ত ভিক্ষু	৩৮
৯। শেষ ভাল যার সব ভাল তার–	ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া	৪০
১০। কর্ম ও কর্মফল–	শ্রীমৎ করুনা বর্দ্ধন ভিক্ষু	৪৩
১১। প্রমাদ ও অপ্রমাদ–	শ্রীমৎ বুদ্ধশ্রী স্থবির	৪৪
১২। অষ্টবিংশতি বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয়–	সুকৃতি দেওয়ান	৪৬
১৩। কর্মই গতি–	সোনা রঞ্জন তালুকদার	৪৯

কবিতা

১। নদীর অদূরে ঘুমন্ত কেন–	শ্রীমৎ সঙ্ঘসার ভিক্ষু	৫২
২। পণ্ডিত ও মূর্খের লক্ষণ–	শ্রীমৎ মহামিত্র ভিক্ষু	৫৩
৩। বর মাঘং–	পদ্মিনী দেওয়ান	৫৪
৪। গম পধ্–	রেখী চাকমা	৫৪
৫। প্রণতি তোমায় প্রভু–	সন্ধান মিত্র তালুকদার। (টুটুল)	৫৪
৬। প্রতীক ও জাগরণ–	জয়নী দেওয়ান	৫৫
৭। পূণ্যর শিঁড়োর–	জিতা চাকমা	৫৫
৮। অষ্টমার্গে নির্বাণ–	দীপন চাকমা	৫৬
৯। আয়ুষ্মান বিশুদ্ধানন্দ–	সুরেশ চন্দ্র চাকমা	৫৭
১০। ১৯৯৭ তুমি কেমন ছিলে –	তৃষ্ণা চাকমা	৫৭
১১। আরাধনা–	তৃতীয়া চাকমা	৫৮
১২। ধর্ম দাগে জাগ'-	মনিকা চাকমা	৫৮
১৩। বন বিহার–	অনামিকা চাকমা	৫৯
১৪। মুক্তির সুর–	রত্না ও রাজকুমারী চাকমা	৫৯
১৫। কর্ম–	বীণা চাকমা	৬০
১৬। মুক্তির পথ–	আল্পনা চাকমা	৬০
১৭। হে বিশুদ্ধানন্দ–	প্রতাপ চাকমা	৬১
১৮। সত্য সন্ধানে–	রবি রঞ্জন চাকমা	৬২

প্রসঙ্গ ঃ নানিয়ার চর রত্নাংকুর বন বিহার

হৃদয় রঞ্জন চাকমা
সভাপতি, পরিচালনা কমিটি
ও
প্রভাত কুসুম চাকমা
সাধারণ সম্পাদক, পরিচালনা কমিটি

গোড়ার কথা ঃ

দিনটি ছিল ২৯শে অক্টোবর ৯৭ইং বুধবার। নানিয়ার চর এলাকায় পিণ্ড চারনের জন্য দশ জন ভিক্ষু শ্রমণ ভিক্ষা পাত্র (সাবেক) হাতে রাঙ্গামাটি রাজ বন বিহার থেকে পাতাছড়ি বৌদ্ধ বিহারে আগমন করেন। উক্ত ভিক্ষু শ্রমণ সংঘের নেতৃত্বে ছিলেন শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ ভিক্ষু। তবে তিনি ব্যতীত বাকী নয়জন সকলেই শ্রমণ। ভিক্ষু শ্রমণ কিভাবে পিণ্ড চারন করেন এবং দায়ক-দায়িকা কর্তৃক কি ভাবে পিণ্ড দান দেয়া হয় ইতিপূর্বে এখানকার অধিকাংশ লোকই স্বচক্ষে দেখেনি বললেই চলে। কাজেই পিণ্ড চারন নানিয়ার চর এলাকায় একটি নতুন প্রবাহের সংযোজন।

অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, অদেখাকে দেখা, অজেয়কে জয় করা হচ্ছে মানুষের চির কৌতুহল। তাই অজানাকে জানার মানসে এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে অনেক নর-নারী আগত ভিক্ষু শ্রমনের পিণ্ড চারন দেখতেও পিণ্ড দান করতে আসতে থাকে পাতাছড়ি এলাকায়। আর একটা কৌতুহল হল যে, দু'একজন ভিক্ষু শ্রমন নাকি জঙ্গলে বসে ভাবনা করেন। তাই ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দেখতে এবং আশীর্বাদ নিতে এলাকার ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকারা প্রবল আগ্রহের সাথে প্রতিনিয়ত আসতে থাকে পাতাছড়িতে। এভাবে খুব দ্রুত প্রচার লাভ করতে থাকে রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার থেকে শ্রদ্ধেয় বনভান্তের শিষ্য আগমনের সংবাদ। প্রয়োজন পড়লো ভাবনা কুটির নির্মাণের।

অরণ্য কুটির ঃ

দেখা গেল শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ ভিক্ষু বিহারে অবস্থান করেন না। তিনি শুধু পিণ্ড চারণের সময় এবং মাঝে মধ্যে দেশনা শোনাতে বের হন। বাকী সময়টা তিনি অরণ্যে বসেই ভাবনা করেন। অরণ্যচারী হলেও অন্ততঃ একটা নিরিবিলি ও সুবিধাজনক স্থানেরতো প্রয়োজন। তাই পাতা ছড়ি ও ডানে সাবেক্ষ্যং এর মধ্যবর্তী দচলা নামক পাহাড়ের অরণ্যে বিশুদ্ধানন্দ ভান্তের জন্য একটি

এবং শ্রমনের জন্য একটি মোট দুইটি ছোট্ট গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হয়। সে গৃহ গুলির নাম দেয়া হয় "অরণ্য কুটির"। সেখানে বসে তাঁরা ভাবনা করেন। তবে অরণ্য কুটির আদতে কত বড় হওয়া দরকার বা কুটিরে কি কি জিনিসের প্রয়োজন তা এখানকার কেউ জানতো না।

সারোয়াতলী থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ঃ

শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ ভিক্ষু নানিয়ার চরে এসেছিলেন সারোয়াতলী অরণ্য কুটির থেকে। সেখানে তিনি প্রায় ৩ বৎসর ভাবনা করেছিলেন। তাঁর নানিয়ার চরে আগমনের সুবাদে স্বাভাবিক ভাবে সারোয়াতলীর সাথে নানিয়ার চরের একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। এ সম্পর্ক অন্য কিছুতেই না হলেও অন্ততঃ ধর্মীয় কারণে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাই স্বাভাবিক কারণে দুই জায়গার দায়ক-দায়িকাগণ অত্যন্ত হৃদ্যতার সাথে সৌজন্য সফর বিনিময় করতে আরম্ভ করেন। নানিয়ার চর থেকে সারোয়াতলী সফরে গিয়ে অনেকেই সেখানকার অরণ্য কুটির পরিদর্শন করেন। তাঁরা সেই অরণ্য কুটিরের পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা দেখে অত্যন্ত লজ্জায় শংকিত হয়ে পড়েন। মনে মনে ধিক্কার জানাতে থাকেন নিজের অজ্ঞতাকে। কারণ সারোয়াতলীর দায়ক-দায়িকারা সেখানকার অরণ্যচারী ভিক্ষুদের নিরিবিলি ভাবনার সুবিধার্থে যে ব্যবস্থাপনা করেছেন তার ষোলভাগের এক ভাগও আমরা নানিয়ার চরে করি নাই।

তবে এখানে একটা কারণ উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা ভেবেছিলাম 'অরণ্য কুটিরে সারাক্ষণ পদ্মাসনে বসে ধ্যান করা ছাড়া অন্য কোন ক্রিয়া নাই। সুতরাং বসার জন্য একটি ছোট্ট পাটি ও পানীয় জল ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন জিনিসপত্র বা চংক্রমনের জন্য বাড়তি গৃহের নিষ্প্রয়োজন।' সেই উর্বর ধারণার মূলে নানিয়ার চর অরণ্য কুটিরে সরবরাহ করা হয়েছিল মাত্র একটি পাটি, একটি কলসী, একটি গ্লাস ও শীত নিবারনের জন্য একটি লেপ। সারোয়াতলী অরণ্য কুটিরের অভিজ্ঞতার আলোকে সেখান থেকে ফিরার পরেই এখানকার কুটিরে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যবস্থাদি সহ চংক্রমনশালা নির্মাণ করা হয়। শুধুমাত্র অরণ্য কুটিরের বেলায় নয় বিহার নির্মাণ, পরিচালনা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য নানিয়ার চর এলাকাবাসী সারোয়াতলীর ভূমিকার কথা আজীবন কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করবে।

পাতাছড়ি বৌদ্ধ বিহার নানিয়ার চর রত্নাংকুর বন বিহারে রূপান্তর ঃ

এলাকার দায়ক-দায়িকাবৃন্দ বহুদিন ধরে নানিয়ার চরে একটি শাখা বন বিহার প্রতিষ্ঠার আশা পোষণ করে আসছিলেন। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি ও কার্যকর পদক্ষেপের অভাবের কারণে সে স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। এবার রাঙ্গামাটি রাজ বন বিহার থেকে ভিক্ষু শ্রমন এখানে পিণ্ড চারনে আসায় বন বিহারের শাখা বিহার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা আরো জোরালো হয়ে উঠে। প্রস্তাব আসলো পাতাছড়ি এলাকায় একটি শাখা বন বিহার প্রতিষ্ঠিত হলে এলাকায় সকলের খুবই মঙ্গল হবে। কারণ সমগ্র নানিয়ার চর থানা অবস্থানের বিচারে বিহার প্রতিষ্ঠায় খুবই উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত। পক্ষান্তরে পাতাছড়ির দায়ক-দায়িকারাও তাঁদের গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহারটি ভেঙ্গে একটি সুবিধাজনক স্থানে শাখা বন বিহার প্রতিষ্ঠায় ঐকান্তিক সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তাই নভেম্বর '৯৭-এ পাতাছড়ি বৌদ্ধ বিহারটির নাম বিলুপ্ত করে উক্ত বিহারের বুদ্ধ মূর্তি ও সমুদয় সরঞ্জামাদি স্থানান্তর পূর্বক শাখা বন বিহার নির্মাণের মহৎ কাজ আরম্ভ করা হয়। প্রতিষ্ঠতব্য বিহারের নামকরণ করা হয় "নানিয়ার চর রত্নাংকুর বন বিহার" যা বর্তমানে একটি পূর্ণাঙ্গ শাখা বন বিহার হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

বিহার ও অরণ্য কুটিরের জন্য ভূমি দান ঃ

প্রতিষ্ঠানের জন্য ভূমি দান একটি খুবই মহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ দান। বিহার নির্মাণ, সৎপুরুষ বিচরণ ও শীলবান ভিক্ষু অবস্থানের মত পূণ্যময়ী কর্মে ভূমি দান করতে পারাটা আরো অধিকতর ফলদায়ক এবং মহৎ। নানিয়ার চর রত্নাংকুর বন বিহার ও অরণ্য কুটির এলাকার জন্য যে সকল শ্রদ্ধাবান ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকা নিজ নামীয় বন্দোবস্তিকৃত বা দখলীভুক্ত ভূমি শ্রদ্ধার সহিত দান করেছেন তাঁদের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো।

বিহার এলাকার জন্য ঃ- ১। অংগনা রঞ্জন চাকমা(৯ একর), ২। পরলোকগত বিপিন বিহারী চাকমার পক্ষে তাঁর উত্তরসূরী- বিপুলাক্স চাকমা, সেন্ট্রো চাকমা, যুব রঞ্জন চাকমা, শুভ রঞ্জন চাকমা ও জনতা শেখর চাকমা (৮ একর), ৩। প্রতি রঞ্জন চাকমা (২ একর), ৪। উদয়ন দেওয়ান (১ একর), ৫। যুবরাজ চাকমা (২ একর), ৬। নমিতা চাকমা (১ একর), ৭। কমল কৃষ্ণ চাকমা (১ একর), ৮। বিরন্দ মহি চাকমা (১ একর), ৯। ডানে সাবেক্ষ্যং ও হরিনাথ ছড়ার দায়ক-দায়িকাবৃন্দ (১ একর), ১০। সুব্রত চাকমা (৩ একর), ১১। পূর্ণলাল চাকমা এবং তাঁর মা (৩ একর)। সর্বমোট= ৩২ একর।

অরণ্য কুটির এলাকার জন্য ঃ- ১। পদ্মলাল চাকমা (২ একর), ২। রবিকুমার চাকমা (৩ একর), ৩। প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা (৩ একর), ৪। কৃষ্ণ কুমার চাকমা (৩ একর), ৫। দয়া রঞ্জন চাকমা (২ একর), ৬। মুরতি মোহন চাকমা (৪ একর), ৭। লালন জ্যোতি চাকমা (৬ একর), ৮। হৃদয় রঞ্জন চাকমা (৬ একর), ৯। সাধন কুমার চাকমা (৫ একর)। মোট= ৩৪ একর।

তাছাড়া আরো যারা ভূমি দান করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন কিন্তু এখনো লিখিতভাবে দান কবলা সম্পাদন করা হয় নি তাঁরা হলেন–

১। বিনোদ বিহারী খীসা (৫ একর), ২। অরিন্দম চাকমা (৬ একর), ৩। সাধন কুমার চাকমা-২ (৫ একর), ৪। গাজী চাকমা (৬ একর), ৫। জ্ঞান রঞ্জন চাকমা (৬ একর), ৬। সুরত কুমার চাকমা (৩ একর), ৭। শৈলেন্দ্র চাকমা (৬ একর), ৮। তুঙ্যা চাকমা (৫ একর), ৯। শুক্রমনি চাকমা (৩ একর), ১০। সতীশ চন্দ্র চাকমা (৬ একর), ১১। চপল চাকমা (৫ একর), ১২। উৎসব চন্দ্র চাকমা (১৫ একর), ১৩। রাজেন্দ্র লাল চাকমা (৩ একর), ১৪। নাগর চান চাকমা (১৫ একর)।

অন্যদিকে ৬১ নং মাইচ ছড়ি মৌজা থেকে প্রায় ২০ একর খাস পাহাড় কুটির এলাকার জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। সুতরাং অরণ্য কুটির এলাকার আওতায় বর্তমানে মোট ১৩১ একর পাহাড় রয়েছে। ইহা বলে রাখা দরকার যে, অপরাপর ভূমি দাতাদের দানের ফলে অরণ্য কুটির এলাকার পরিসীমা অদূর ভবিষ্যতে আরো যে সম্প্রসারিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এ বিহার প্রতিষ্ঠায় শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ ভান্তের ভূমিকা ঃ

কথায় বলে, ব্যাপক জনসাধারণের অগণিত মাথা আছে কিন্তু মগজ নাই। এলাকাবাসীরা বিহার নির্মাণের জরুরী প্রয়োজনীয়তার কথা মুখে হরেক রকম ভাবে বলে থাকলেও সংগতির অভাবে সেই পরিকল্পনা কার্যকারীতার মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। কারণ উদ্দ্যোক্তা ও সঠিক দিক নির্দেশকের অভাব থাকলে অসংগতি দেখা দেয়া স্বাভাবিক। যে কোন সম্মিলিত কর্তব্য সাধনের পিছনে ২/১ জন মহৎ উদ্দ্যোক্তা ও প্রেরণাদানকারীর অবদান থাকে সবচেয়ে বেশী অগ্রগণ্য। নানিয়ার চর রত্নাংকুর বন বিহার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাঁর অগ্রগণ্য অবদান সর্বাগ্রে স্মরণ করতে হয় তিনি হচ্ছেন, শ্রদ্ধেয় বন ভান্তের অন্যতম শিষ্য শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ ভিক্ষু। তাঁর অনুপ্রেরণা ছাড়া এ

বিহার এত দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না বলা যায় নিঃসন্দেহে। নানিয়ার চর এলাকার ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকাদের মানস পটে শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ ভান্তের নাম চির প্রতীক হয়ে থাকবে।

এ বিহার প্রতিষ্ঠায় এলাকাবাসীর ভূমিকা ঃ

শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ ভান্তে একদিন দায়ক-দায়িকাদের সাথে মত বিনিময় কালে বললেন, "আগামী মাঘী পূর্ণিমা '৯৮ তিথিতে শ্রদ্ধেয় বনভান্তের উপস্থিতিতে নব প্রতিষ্ঠিতব্য বিহারটি শুভ উদ্বোধন ঘটাতে হবে।" হিসাব করে দেখা গেল হাতে মাত্র আড়াই মাসের মত সময়। সেই আড়াই মাসের মধ্যে দেশনা গৃহ সহ মূল বিহার, বনভান্তের ভোজনও বিশ্রাম কুঠি, বিশুদ্ধানন্দ ভান্তের জন্য চংক্রমন শালা সহ ভাবনা কুটির, একাধিক ভিক্ষু শালা, একাধিক শ্রমণ শালা, অষ্ট শীলার অবস্থান গৃহ, ভিক্ষু সংঘের ভোজন শালা, পূজা নির্মাণ গৃহ, পাকঘর, কার্যালয়, অতিথিশালা..... ইত্যাদি সবই নির্মাণ করতে হবে। তাই কাজের পড়ে গেল হিড়িক। মাটি কাটা থেকে আরম্ভ করে গাছ-বাঁশ সংগ্রহ ও গৃহ নির্মাণ কাজ চলতে থাকে দিন-রাত অবিশ্রান্ত ভাবে। এলাকার যুবক-যুবতী ও ছাত্র-ছাত্রীরা রাতে চাঁদের আলোতে বা লাইট জ্বালিয়ে উৎসাহ উদ্দীপনাভরে বিশাল মাটি কাটার কাজ দেখতে দেখতে সমাপ্ত করে ফেলেন। এলাকার প্রায় প্রতিটি গ্রাম থেকে ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকাবৃন্দ প্রতিনিয়ত দলে দলে বিহার নির্মাণের কাজে অংশ নিতে থাকেন। এতে করে কাজের গতি হয় দ্রুততর। সারোয়াতলী থেকে শ্রদ্ধাদান হিসাবে পাঠানো হয় ৮০টির মত সেগুন গাছের খুঁটি। বিহার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এলাকাবাসী কায়িক, বাচনিক, মানসিক, আর্থিক সর্বোতভাবে সাহায্য সহযোগিতার কোন কার্পণ্য করেনি। বিহার প্রতিষ্ঠা লগ্নে এক হাজার টাকার বেশী মূল্যমানের নির্মাণ সামগ্রী বা নগদ অর্থ যারা শ্রদ্ধা দান দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন– সুরেশ চন্দ্র চাকমা, নয়ন রঞ্জন মহাজন, কিরণ ধর চাকমা, জয় সেন চাকমা, রূপায়ন বড়ুয়া, হৃদয় রঞ্জন চাকমা, অজিত কুমার চাকমা, অঙ্গনা রঞ্জন চাকমা, ক্ষেত্র মোহন চাকমা, সুনীল বিকাশ চাকমা, বিপুলাক্ষ চাকমা, গিরিশ চন্দ্র চাকমা, প্রমোদ বিকাশ তালুকদার প্রমূখ।

এছাড়াও যে যার সামর্থ্যানুযায়ী অকুণ্ঠ চিত্তে প্রসারিত করেন সাহায্য-সহযোগিতার হাত। তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ ও বনভান্তের কৃপাশীর্বাদে এবং এলাকাবাসীর নিরলস প্রচেষ্টায় দেখতে দেখতে আড়াই মাসের মধ্যে (মাঘী পূর্ণিমা '৯৮ এর মধ্যে) নির্মাণাধীন নানিয়ার চর রত্নাংকুর বন বিহার রূপায়িত হয় একটি পূর্ণাঙ্গ বিহারে। এত সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে এহেন বিশালায়তনের বিহার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এলাকাবাসীর অবদানের কথা নানিয়ার চর রত্নাংকুর বন বিহারের ইতিহাসে চির অম্লান হয়ে থাকবে।

এ বিহার স্থাপনের সুফল ঃ

কালের প্রবাহে ১৯৯৭ সনের প্রথমার্ধে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে মদ, জুয়া, চুরি, ডাকাতি, খুন-খারাপি ইত্যাদির মত সামাজিক অবক্ষয় মূলক কর্মকাণ্ড মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। নৈতিক অধপতিত মদ-জুয়ারীরা রাস্তা ঘাটে, গাছতলায়, গ্রাম্য দোকানে, বাড়ী-বাড়ী, হাট-বাজারে, যান-বাহনে তাদের সেই সর্বনাশা আসর বসিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু নানিয়ার চর রত্নাংকুর বন বিহার তার তীব্র বিরোধিতা আরম্ভ করে। বিহারে অবস্থানরত ভিক্ষুগণ প্রতিনিয়ত ধর্ম দেশনার মধ্য দিয়ে, গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিহারে ডেকে দায়ক-দায়িকাদের সেই সর্বনাশা ক্রিয়া থেকে বিরত থাকতে সর্বদা উপদেশ প্রদান করতে থাকেন। ফলে পুরোদমে না হলেও অন্ততঃ কিছু কিছু এলাকায় মদ, জুয়া, চুরি, ডাকাতি ও খুন-খারাপির প্রভাব অন্যান্য এলাকার মত এত বেশী গ্রাস করতে পারে নি। বলতে গেলে সেই মারাত্মক সামাজিক ব্যাধির প্রতিষেধক হিসাবে এ বিহার অনন্য ভূমিকা রেখেছে এবং রেখে যাচ্ছে। অন্যদিকে মানুষের মন থেকে হিংসা বৃত্তি পরিহার

করে ধর্মীয় আচরণে অনুপ্রাণিত করতঃ সামগ্রিক ভাবে সকলের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধিত হচ্ছে। সুতরাং মঙ্গল, কল্যাণ ও আত্মিক শান্তির ক্ষেত্রে নানিয়ার চর রত্নাংকুর বন বিহার এক অনন্য ক্ষেত্র।

বিহারের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

বর্তমানে মূল বিহার, দেশনা গৃহ, বনভান্তের বিশ্রামাগার, বিশুদ্ধানন্দ ভান্তের ভাবনা কুটির ও চংক্রমনশালা টিনের ছাউনী অবস্থায়। বাকী সব গৃহ বা কুটির সমূহ এখনো বাঁশের ছাউনী (তর্জা) দিয়ে ঢাকা। সমস্ত বিহার এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ এবং মূল্যবান জাতীয় বৃক্ষ রোপণের কাজ চলছে। অদূর ভবিষ্যতে মূল পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে (১) মূল বিহার দোতলাকরন, (২) বন ভান্তের বিশ্রাম কুটি দোতলাকরণ, (৩) দচলা অরণ্য কুটির তলা পাকা ও টিনের ছাউনীকরণ, (৪) ভিক্ষুশালা সমূহ টিনের ছাউনী ও তলা পাকাকরণ, (৫) শ্রমন শালা, ভোজন শালা, অষ্ট শীলার ঘর, পাকঘর ও কার্যালয় টিনের ছাউনীকরণ, (৬) চংক্রমনশালা, ঘ্যাংঘর নির্মাণকরণ, (৭) অভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাট পাকাকরণ, (৮) ভিক্ষু সংঘের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র নির্মাণ, (৯) একাধিক একক ভাবনা কুটির নির্মাণ ইত্যাদি। এ সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সকলের ঐকান্তিক সাহায্য সহযোগিতা ও সরকারী পৃষ্ঠ পোষকতার নিতান্তই প্রয়োজন।

শেষের কথা ঃ

আমাদের সমাজের লোক হচ্ছে হুজুগী, এটা আমাদের মজ্জাগত দোষ। হুজুগের তাড়নায় আমরা অনেক কিছু করে ফেলি, বলে ফেলি। সূচনা বিশাল, উপসংহার সারশূন্য। এ বিহারের ক্ষেত্রে তা হলে চলবে না। বাগানে ফলগাছ রোপন করা বড় কথা নয়। প্রয়োজনীয় রক্ষণা-বেক্ষণই বড় কথা। তিল তিল শ্রদ্ধা ও ইচ্ছাকে পুঁজি করে এলাকার শ্রদ্ধাবান দায়ক-দায়িকাবৃন্দ প্রতিষ্ঠা করেছেন এই রত্নাংকুর বন বিহার। প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভিক্ষু সংঘ ও দায়ক-দায়িকার যেমন প্রশংসনীয় ভূমিকা রয়েছে, সুষ্ঠু পরিচালনা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রেও একই ভূমিকার প্রয়োজন। মেয়াদী হুজুগী হলে ধর্মের নামে হবে অধর্ম। পেশাদারী অন্ধ সমালোচনার বান বর্ষিত হবে সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু নিজে সংযত ও স্থির থাকাটাই হচ্ছে জ্ঞানীর কাজ। প্রতিটি ফুঁ-তে প্রকম্পিত হওয়া দূর্বলতা ও হীনমন্যতার লক্ষণ। ভাল কাজে মারের বাধা থাকে। সেই স্বাভাবিকতাকে মেনে নিয়ে স্থির চিত্তে প্রতিষ্ঠাকালের উদ্যোমতাকে তাজা রেখে নানিয়ার চর রত্নাংকুর বন বিহারকে বৌদ্ধ ধর্মের তীর্থ পীঠ হিসাবে গড়ে তোলাই হোক ভিক্ষু সংঘ ও দায়ক-দায়িকা সকলের প্রত্যয়।

অধর্মের দ্বারা মানুষ আপাতত ঃ সমৃদ্ধ হয় এবং কল্যাণের দেখা পায়, অতঃপর শত্রুদেরও জয় করে (কিন্তু পরিনামে) সমূলে বিনষ্ট হয়। –"ধম্মপদ"

ধর্ম বন্ধন

ভিক্ষু জে, প্রজ্ঞাবংশ
কাটাছড়ি অরণ্য কুটির, রাঙ্গামাটি

চেতনা যার মহৎ সমগ্র বিশ্ব তার বন্ধু। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, গোষ্ঠীগত ও সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের চাইতে ধর্মীয় বন্ধন বহুগুণে উদার, মহৎ এবং ব্যাপক। এই বন্ধনে নিজেকে গভীরভাবে আবদ্ধ করতে পারলে ব্যক্তি ও সমষ্টির আত্মরক্ষার নৈতিক শক্তি ও সাহস এবং আত্ম মর্যাদা বোধ বেড়ে যায় অকল্পনীয় ভাবে।

রাজা অশোক রাজ্য জয়ে পেশী শক্তি ও অস্ত্র শক্তির পরিবর্তে ধর্মশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তাঁর এই মহৎ কৌশল তাঁকে করলো কালজয়ী ইতিহাস শ্রেষ্ঠ সম্রাট। বৃটিশেরা ভারত উপ-মহাদেশে এসেছিলেন ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। দেশীয় শাসকদের দূর্বলতার সুযোগে ব্যবসা ও রাজত্ব দু-ই হাতিয়ে নিলেন শেষ পর্যন্ত। কিন্তু রাজনৈতিক নীতি পদ্ধতির হাজারো পরিবর্তন সত্ত্বেও টিকতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত বিদায় নিলেন। বৃটিশেরা রাজনৈতিকভাবে বিদায় নিলেও মিজোরাম, মেঘালয় সহ উপ-মহাদেশে সর্বত্র খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা যে ধর্মরাজ্য তাঁরা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তা-কি কখনো বিদায় নেবে? একইভাবে সম্রাট ধর্মাশোকের "ধর্ম বিজয়"–নামক মিশনের মাধ্যমে লংকা, বার্মা ও থাইল্যান্ডে যে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা তিনি করেছিলেন তাঁর স্থায়িত্ব আজ কতকাল? আসলে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম সাম্রাজ্যবাদ বা আঞ্চলিকতাবাদ এসকল রাজনৈতিক মতবাদের চাইতে ধর্মীয় মতবাদের শক্তি ও স্থায়িত্ব অনেক অনেক বেশী।

বৃটিশেরা এই ভারত উপ-মহাদেশের রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছিলেন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মুসলমানদের হাত থেকে। তাই এদেশে বৃটিশদের প্রায় দু'শ বছরের শাসনামলে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ই ছিলেন সবচেয়ে বেশী উপেক্ষিত ও অবহেলিত। এত দীর্ঘকাল শাসন-শোষণের পরেও সেই মুসলমানেরা অখন্ড ভারতের বুকে আজ পৃথক দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যের অধিকারী হয়ে সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর এত অমিত শক্তির উৎস কোথায়? সিন্ধী, পাঞ্জাবী, বেলুচ বাঙ্গালী সকল মুসলমান ধর্মের গভীর বন্ধনে একাত্ম হয়ে যাওয়াতেই ছিল এই অমিত শক্তির বিশাল ভান্ডার। তাঁদের গভীর ধর্ম প্রেমই ছিল আত্মরক্ষা ও আত্মশক্তি উদ্বোধনের মূলমন্ত্র। দেখা গেছে বৃটিশ শাসক গোষ্ঠীর কোন প্রকার দান অনুদান বা সাহায্য সহযোগীতা ছাড়াই এই উপ-মহাদেশের মুসলমানেরা নিজেদের প্রতিটি মসজিদ সংলগ্ন করে তুলেছিলেন মক্তব, মাদ্রাসা নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। ধর্মীয় ও ব্যবহারিক শিক্ষক মৌলানাদের শিক্ষা ভাতা অটুট রেখেছিলেন গরীব কৃষকদের ক্ষেতের ফসল এবং দিন মজুরদের দৈনিক রোজগারের অংশ হিসেবে ক্রয় করা ভাতের চালের অংশ বিশেষ প্রদান করে পর্য্যন্ত। তাঁরা শিশু কিশোরদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষাকে সামাজিকভাবে বাধ্যতামূলক করেছিলেন অসাধারণ দূরদর্শীতার সাথে। মুসলিম সমাজের এই বিধি-ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে শুধুমাত্র ভারত উপ-মহাদেশে নহে, আজ সমগ্র বিশ্বের মুসলমানেরা ধর্মের গভীর সৌভ্রাতৃত্বে পরিণত হয়েছে একটি মাত্র ইসলামিক পরিবারের সদস্যে।

একসময় পর্তুগীজ বণিকেরা শ্রীলংকা দখল করে তাঁদের উগ্র খৃষ্ট ধর্মান্ধতার শিকার করেছিলেন শ্রীলংকার বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীকে। ফলে অধিকাংশ বৌদ্ধ-খৃষ্টান ধর্মান্তর গ্রহণ করেন। সেদেশের বৌদ্ধরা স্বীয় অস্তিত্ব বিপন্ন দেখে ভিক্ষু গুণরত্ন ও অনাগারিক ধর্মপাল প্রমূখ কিছু ভিক্ষু-গৃহী এক পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিটি বিহারে ও গ্রামে শুরু করলেন প্রভাতী শিশু শিক্ষার আন্দোলন। সামাজিক উদ্যোগে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবী এই শিশু শিক্ষার আন্দোলন ক্রমে সেদেশের শিশু-কিশোরদের ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষার প্রধান ভিত্ হয়ে গেলো এবং তাহা একটি বাধ্যতামূলক সামাজিক প্রথায় রূপায়িত হলো। শ্রীলংকার বৌদ্ধ ধর্মগুরু এবং মাতা-পিতাদের সেদিনের এই

মহতী উদ্যোগের আশীর্বাদে শ্রীলংকায় শতকরা একশো জন লোক আজ শিক্ষিত হলেন এবং বৃটিশদের নিকট থেকে একটি স্বাধীন বৌদ্ধ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায়ে সক্ষম হলেন।

স্বাধীন সার্বভৌম শ্রীলংকায় এখন রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব। তাই বলে বিহার ভিত্তিক "শিশু শিক্ষা" নামক সামাজিক প্রথাটি কিন্তু মুছে দেয়া হয়নি। সম্পূর্ণ অবৈতনিক এবং কোন প্রকার সরকারী সাহায্য সহযোগীতা ছাড়াই শ্রীলংকার বৌদ্ধ ধর্মগুরু ও মাতা-পিতারা নিজেদের দায়-দায়িত্বের প্রধান কর্তব্য হিসেবে প্রতিটি বিহারে স-গৌরবে অক্ষুন্ন রেখেছেন তাঁদের সন্তানদের জন্যে বিহার ভিত্তিক সপ্তাহের ছুটির দিনে ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থাটি। সামাজিক এই ধর্মীয় শিক্ষাকে উপলক্ষ করে সমগ্র শ্রীলংকায় সপ্তাহের রবিবারটি আজ তাঁদের একটি পবিত্র "ধর্ম দিনে" পরিণত হয়েছে। এই দিনে শ্রীলংকার বৌদ্ধরা সকাল ৮টা হতে ১০টা পর্যন্ত (ভিক্ষুশ্রমন ও উপাসক-উপাসিকা) সকলেই শিক্ষক-শিক্ষিকায় পরিণত হন আপন সন্তানদেরকে ধর্মীয় ও ব্যবহারিক শিক্ষা দানের জন্যে। আর বিকাল ৩টা হতে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত সকলেই হয়ে যান ধর্মদেশক ও ধর্ম শ্রমনকারী। এভাবে শ্রীলংকানরা পবিত্র উৎসব মুখর করে তোলেন সপ্তাহের ছুটির দিনটিকে। শ্রীলংকান বৌদ্ধদের এই 'ধর্ম দিবসটি' শ্রীলংকার সর্বশ্রেণীর বৌদ্ধ জনসাধারণকে করেছে ধর্মীয় সৌভ্রাতৃত্বের গভীর বন্ধনে আবদ্ধ। আর সেই শক্তির প্রভাবেই বিশ্বজুড়ে বিশাল তামিল জাতির প্রবল আগ্রাসী হিংস্র আঘাতের বিরুদ্ধে বিগত প্রায় দু'দশক ধরে তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে, এখনো টিকে আছেন। শ্রীলংকার শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষায় সুশিক্ষিত করার কারণেই ব্যবহারিক শিক্ষায় তাঁরা যত উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হউন না কেন, তাঁদের ধর্মীয় সৌভ্রাতৃত্ব বোধে তাঁদেরকে নিরহংকারী, নিরভিমানী মাটির মানুষে আপন ধর্ম-বিশ্বাস ও কৃষ্টি সংস্কৃতিকে নিঃসংকোচে উর্ধ্বে তুলে ধরতে তাঁরা অসাধারণ মনোবলের অধিকারী।

বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় এদেশের মোট জন সংখ্যার শতকরা একজনও নহেন। আজ যারা এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায় তাঁরা বলতে গেলে প্রায় সকলেই ছিলেন এদেশের প্রাচীন ধর্মীয় জনগোষ্ঠী বৌদ্ধদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বুদ্ধ ধর্মের নামে অবৌদ্ধ কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও আচার বিশ্বাসে দিকভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট হয়েই এদেশের বৌদ্ধরা আজ সংখ্যা লঘুতম সম্প্রদায়ে পর্যবসিত হয়েছে। যে ধর্মের উচ্চতম আদর্শে বাংলাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি এককালে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল, সমগ্র এশিয়া মহাদেশে আজ সেই ধর্মকে অযত্ন, অবহেলা ও বিকৃতির শিকার করে বাংলার বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী হারালো ধর্ম, হারালো রাজ্য, হারালো একে একে প্রায় সব কিছু। সৌভাগ্যক্রমে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে বৃটিশ শাসনামল পর্যন্ত বৌদ্ধরা অতিকষ্টে নিজেদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা বজায় রাখলেও আজ তা-ও প্রায় বিপর্যস্ত। এই বিপর্যয়ের মূল অনুসন্ধান করতে গেলে ঘুরে ফিরে একটি দূর্বলতাই বড়ো হয়ে দাঁড়ায়- তাহলো আমাদের জন-মানস এখনো ধর্মানুভূতিকে, ধর্মশিক্ষা ও অনুশীলনকে তেমন কোন মূল্য দিতে রাজী নহেন। রাজনৈতিক আঞ্চলিকতাবাদ সাময়িক প্রাধান্য পেলেও ধর্মীয় সৌভ্রাতৃত্বহীন এই আবেগ ব্যক্তি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী স্বার্থের প্রবল সংঘাতে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সম'ধিক। আর এই আশংকা যদি সত্যে পরিণত হয়, তাহলে এদেশের মাটি থেকে আমরা চিরতরে মুছে যাওয়া এক মারাত্মক পটভূমি শীঘ্রই রচনা করবো আমাদেরই হাতে।

পৃথিবীর খৃষ্টান সমাজ সপ্তাহের শনি ও রবিবারে, মুসলমান সমাজ শুক্রবারে ধর্মদিন যাপন করেন। এই ধর্মদিন যাপনের কারণে তাঁরা কি আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা শিক্ষায় খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত? আর আমরা বৌদ্ধরা সাপ্তাহিক 'ধর্ম দিনের' জন্যে সময় নষ্ট না করে তাঁদের চেয়ে কি বহুগুণে বেশী উন্নত হয়ে গেছি?

খৃষ্টান ও মুসলিম সন্তানেরা স্কুল-কলেজের শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ ও দৈনন্দিন জীবনে তার অনুশীলনে গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা অটুট রাখাতে তাঁদের স্কুল কলেজের শিক্ষায় কোন ব্যাঘাত হয় না। অথচ আমাদের সন্তানেরা স্কুল-কলেজে পড়ার অজুহাত দেখিয়ে এমনি কি ধর্মশিক্ষাকে অবাস্তব, অপ্রয়োজনীয় ও লজ্জাজনক মনে করে সামাজিক, জাতীয়, রাষ্ট্রীয় ও বিশ্বে কত বেশী সম্মানের অধিকারী হলো?

আমাদের বাবা-মায়েরা সন্তানদের স্কুল-কলেজের শিক্ষার জন্যে, নাচের ক্লাশ বা গানের ক্লাশের জন্যে যে ভাবে উৎসাহ বোধ করেন; সন্তানদেরকে ধর্ম শিক্ষা দানের জন্যে সেই উৎসাহ উদ্দীপনা কতটুকু? ধর্মশিক্ষা ও অনুশীলনের দ্বারা সন্তানকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের ভিত্ দান না করতে পারলে আধুনিক ভোগ সর্বস্ব বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষায় মা-বাবার সব স্বপ্ন যে চুরমার হয়ে যাবে এই সত্যের উপলব্ধি ঘটবে কবে?

খৃষ্টান, মুসলিম সহ পৃথিবীর বহু ধর্ম সম্প্রদায় নিজেদের দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বার্ষিক উপার্জনের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ ধর্মের নামে পর কল্যাণার্থে নিয়মিত এবং বাধ্যতামূলকভাবে দান করে থাকেন। জাকাত, কিত্‌রা বা মিশনারী ফান্ডের মাধ্যমে এই দান সংগ্রহ করে মুসলিম ও খৃষ্টান মিশনারীরা বিশ্বের সর্বত্র স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল ইত্যাদি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন এন, জি, ও সংস্থা গঠন করে বিশ্বের ক্ষুধা তাড়িত দরিদ্র জন সমাজের ভাগ্যন্নোয়নে ব্যাপক অবদান রাখার পাশাপাশি স্ব-স্ব ধর্মের নিত্য নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন। অথর্চ আমরা বৌদ্ধরা! বিশ্বের কথা দূরে থাক আপন ঘরের ও সমাজের কল্যাণে পর্যন্ত এই নির্দিষ্ট ও নিয়মিত "ধম্মার্থে-দান" প্রথা চালু করতে এত অনীহা কেন?

মানুষ সু-শিক্ষা না পেলে কখনো দূরদর্শী, উন্নত, ত্যাগী ও উদার মানসিকতার অধিকারী হতে পারেন না। আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক ভোগ সর্বস্ব শিক্ষা, সুশিক্ষার এই আদর্শ ধারণ না করার কারণে আজ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ধনীদেশ সমূহে মাদকাশক্তি ও নৈতিক অবক্ষয়, দিন দিন যেভাবে রূপ নিচ্ছে; আমাদের ন্যায় দরিদ্র পীড়িত দেশেও তার ব্যতিক্রম কোথায়? স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে পরীক্ষার হলে নকল সর্বস্বতা, নিয়মিত অধ্যায়ন ছেড়ে ছাত্র রাজনীতির নামে নিত্য হানাহানি, শিক্ষিত বেকারদের মাদকাশক্তি সহ সঙ্ঘবদ্ধ ডাকাতি, হাইজ্যাকিং ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত হওয়ার ক্রমবর্ধমান প্রবনতার মধ্যে আধুনিক শিক্ষার অন্তঃসারশূণ্য স্বরূপটা আজ প্রকট হয়ে উঠছে নয় কি?

বিজ্ঞানের অগ্রগতির অবদানে যে জীবন ব্যবস্থা আজ বিশ্বমানব গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছে তাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে হাজার বছর অতীতের সেই শান্ত, সৌম্য তপোবনে ফিরে যাওয়ার সুযোগ আর নেই। অথচ সেই তপোবনের সেই আদর্শকে বেমালূম ভুলে যাওয়ায় যে পরিণতি এখন নাকের ডগায় এসে উপস্থিত "গ্রীন হাউস এফেকট্"– নামক এই বৈজ্ঞানিক ও ইংরেজী শব্দটার তাৎপর্যকেতো আর অস্বীকার করা যাবে না। বিজ্ঞান প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করতে গিয়ে নিজেই এখন প্রকৃতির শিকার হয়ে পড়েছে।

তাই আসুন, আমরা বিজ্ঞান ও প্রকৃতির সমন্বয় সাধনকে ধর্মের মানবিক বোধনে উজ্জীবিত করতে সংকল্পাবদ্ধ হই। মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশে এ বিশ্বে 'বুদ্ধের' মতবাদের তুলনা নেই। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা ও প্রজ্ঞা এই পঞ্চ মহাগুণের বিশাল ভান্ডার 'বুদ্ধের' মতবাদ। এই মতবাদকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় ক্রুসেড বা জেহাদ্ নামক রক্তঝরা ধর্ম যুদ্ধের প্রয়োজন অতীতেও কখনো হয়নি, বর্তমানেও নেই, ভবিষ্যতেও হবেনা। দয়া, ভালবাসা, সন্তুষ্টিতা, ক্ষমা আর জ্ঞানের আলোময় পথে "বুদ্ধ ধর্মের" যে বিজয়যাত্রা হাজার বছর ধরে অপ্রতিহত ছিল, তা আজ থেমে গেছে যুগোপযুগী গবেষণা ও সঠিক প্রয়োগ প্রচেষ্টার একান্ত অভাবের কারণেই। আমার ও আমাদের সকলের কল্যাণে এই জড়তার অপসারণ করার দায়-দায়িত্ব নিতে হবে। ব্যক্তি হতেই সমষ্টি। তাই নিজেকে দীক্ষার ব্রত ঘর থেকেই শুরু হোক। "মহাকারুনিক বুদ্ধের শান্তি ও সমৃদ্ধির স্নিগ্ধ ধারা আসুক নেমে, আমাদের কাছে পরার্থের মঙ্গলময় ঝর্ণারথে।"

"ভবতু সব্ব মঙ্গলম্"

যুদ্ধ জয় শত্রুর সৃষ্টি করে। পরাজিত অতিশয় দুঃখে কাল কাটায়। কিন্তু যিনি রাগ দ্বেষাদি উপশম করিয়াছেন, তিনি জয় পরাজয় পরিহার পূর্বক শান্তিতেই জীবন যাপন করেন। –"ধম্মপদ"

দানশীল ভাবনার তাৎপর্য

শ্রীমৎ জিন প্রিয় ভিক্ষু
নানিয়ার চর রত্নাংকুর বন বিহার

কর্ম দুই ভাগে বিভক্ত। যথাঃ (১) কুশল কর্ম ও (২) অকুশল কর্ম। কুশল কর্ম আবার দুই প্রকার। যথাঃ (১) লৌকিক কুশল কর্ম ও (২) লোকত্তর কুশল কর্ম। লৌকিক কুশল কর্ম ত্রিবিধ। যথাঃ (ক) দান, (খ) শীল ও (গ) ভাবনা। নিম্নে দান, শীল ও ভাবনার কথাই আলোকপাত করা হল।

দান ঃ জগতে সত্য ধর্ম বিশ্বাসী নর-নারী মাত্রেরই ইহ পর কালের সুখ সমৃদ্ধির নিমিত্তে যথা সাধ্য দান দিয়ে কুশল কর্ম সম্পাদন করা উচিত। "দাযতীতি দানং।" স্বার্থ ত্যাগ করে যা প্রদান করা হয় তা'ই দান। ক্ষেত্র হীন ব্যক্তির যেমন ফসলের আশা নিষ্ফল, তেমনি দানহীন ব্যক্তির ভোগৈশ্বর্যের আশাও নিষ্ফল। দানের হেতু অলোভ। দানের প্রভাবে ইহ পরলোকে ভোগ সম্পদ উৎপন্ন হয়। বিষয় সম্পত্তি ত্যাগের অভ্যাস ও নির্বান লাভের পূণ্য সঞ্চিত হয়। তাই দানী হওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলা দুঃখ মুক্তির ক্ষেত্র সৃষ্টি করারই নামান্তর। তবে দান দেয়ার পূর্বে তিনটি বিষয় জেনে রাখা নিতান্তই প্রয়োজন। (১) বস্তু সম্পত্তি, (২) চিত্ত সম্পত্তি ও (৩) প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি।

১. বস্তু সম্পত্তি ঃ বস্তু (দানীয় সামগ্রী) সম্বন্ধে বিচার। অসৎ উপায়ে উপার্জিত টাকা-পয়সা বা বস্তু দান করলে তা কুশলাকুশল মিশ্র ফল লাভ হয়। এরূপ মিশ্র দান হীণ। সৎ উপায়ে উপার্জিত অর্থ বা বস্তু পরিশুদ্ধ বস্তু সম্পত্তির মধ্যে গন্য। সুতরাং সৎউপায়ে উপার্জিত বস্তু বা বিষয় দানের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

২. চিত্ত সম্পত্তি ঃ দানের ক্ষেত্রে চিত্তের চেতনার উপর কুশলাকুশল নির্ভর করে। কারণ– "চেতনাহং ভিক্ষবে কম্মং বদামি"– চেতনাই কর্ম। দানের পূর্বে, দানের সময় এবং দানের পরে চিত্ত লোভ-দ্বেষ-মোহ মুক্ত রাখা উচিত। মদীয় জাতকে উক্ত হয়েছে–

দানের ইচ্ছায় হবে হরষিত মন
দান কালে উপজিবে আনন্দ অপার,
করি দান অনুতাপ হবে না কখন

বংশ বৃদ্ধি হয় তার এই ধর্ম যার।
চিত্তের প্রসন্ন ভাব দান করিবার পূর্বে
দান কালে সুখের সঞ্চার,
দানান্তে আনন্দ ভোগ, এ তিন লক্ষণ যুত
দানে বলি সর্ব যজ্ঞ সার।

৩. প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি ঃ প্রতিগ্রাহক অর্থাৎ যারা দান গ্রহণ করেন, তাদের নৈতিক চরিত্রের উপরও দানফলের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে। মহাশ্বারোহ জাতকে উক্ত হয়েছে।

অপাত্রে করে যে দান *পাত্রে করে প্রত্যাখ্যান*
বিপদে এ হেন মূঢ় হয় অসহায়।
সুপাত্রে উচিত দান *অপাত্রের প্রত্যাখ্যান*
করিলে বিপদে লোক সহায়তা পায়॥
"দাযকাহি দেয্য ধম্ম বসেন ত্রিবিধ হোন্তি
দান দাসো, দানসহাযো, দানপতী'তি।"

দানীয় বস্তু ভেদে দায়ক তিন প্রকার। ক. দানদাস, খ. দান সহায় ও গ. দানপতি।

ক. **দান দাসঃ** যে নিজে উত্তম খাদ্য ভোগ করে কিন্তু অন্যকে নিকৃষ্ট খাদ্য প্রদান করে, সে দান দাস নামে অভিহিত।

খ. **দান সহায়ঃ** যে স্বয়ং যেরূপ ভোগ করে এবং অপরকে সেরূপ দান দেয়, সে দান সহায় নামে অভিহিত।

গ. **দান পতিঃ** যে নিজে যেরূপ দ্রব্য ভোগ করে তবে দানের ক্ষেত্রে তার চেয়ে উত্তম বস্তু প্রদান করে সে দান পতি (শ্রেষ্ঠ দাতা) নামে অভিহিত। এজন্য তার দানই সর্বোৎকৃষ্ট দান বলা যায়।

"দানং তানং মনুস্সানং, দানং দুগ্গতি বারনং
দানং মগ্গস্স সোপানং, দানং সন্তিকরং পরং।"

(দান মনুষ্যদের ত্রান করে, দান দ্বারা মানুষের দুর্গতি বন্ধ হয়, দান স্বর্গের সোপান এবং ইহ পরকালে শান্তিকর সুখ আনয়ন করে।)

দানকালে দাতার আরও পাঁচটি অঙ্গ পরিপূর্ণ রাখতে হয়।

১. **অকৃপণতাঃ** দানীয় সামগ্রীর প্রতি লোভমুক্ত চেতনা।
২. **শ্রদ্ধাঃ** দান গ্রহীতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও মৈত্রীগত চিত্ত পোষণ করা।
৩. **সন্তোষঃ** দানকালীন স্বীয় চিত্তে প্রসন্নতা আনয়ন করা।
৪. **প্রীতিঃ** দানকালীন স্বীয় চিত্তে প্রীতি সুখ অনুভব করা।
৫. **মৈত্রীঃ** দান গ্রহীতার প্রতি অপরিসীম মৈত্রী পোষণ করা।

উপরোক্ত অঙ্গ সমুহ পরিপূর্ণ করে অসংকুচিত ও ভাবনাগত চিত্তে অর্থাৎ লোভ-দ্বেষ-মোহ-কৃপনাদি মুক্ত ভাবে দানের ফল বৃথা হয় না। ইহাতে নির্বানও প্রত্যক্ষ করা যায়।

শীল ঃ জগৎ হিতকারী মহাসত্ত্ব তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ তাঁর শিষ্য ও ভক্তদের শৃংখলাপূর্ণ সৎজীবন যাপনের উদ্দেশ্যে যে সব নীতি সমূহের প্রবর্তন করেছিলেন তারই নাম শীল। বৌদ্ধ

পরিভাষায় যাকে বিনয় বলা হয়। শীল শব্দের অর্থ চরিত্র বা স্বভাব। আর চরিত্র বা স্বভাব বলতে উচ্চতর চরিত্র বা উচ্চতর স্বভাবকেই বুঝায়।

প্রতিসম্ভিদা মগ্গ গ্রন্থ মতে শীল চারি প্রকার

১. **চেতনাশীল ঃ** প্রাণী হত্যাদি হইতে বিরমন্ত (পরিত্যাগকারীর) ব্যক্তির ব্রত প্রতিপত্তি (পূরণকারীর) চেতনাই চেতনাশীল।

২. **চৈতসিক শীল ঃ** প্রাণী হত্যাদি বিরমন্ত ব্যক্তির বিরতিই চৈতাসিক শীল। অভিধ্যা (লোভ) পরিত্যাগ করে অভিধ্যাবিগত চিত্তে বিহার করে অনভিধ্যা (অলোভ) অব্যাপাদ (অহিংসা) ও সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়ায় চৈতসিক শীল।

৩. **সংবর শীল ঃ** সংবর শীল মোট পাঁচ প্রকার। (ক) প্রাতিমোক্ষ সংবর শীল, (খ) স্মৃতি সংবর শীল, (গ) জ্ঞান সংবর শীল, (ঘ) ক্ষান্তি সংবর শীল ও (ঙ) বীর্য সংবর শীল।

৪. **অব্যতিক্রম শীল ঃ** গৃহীত শীল ব্যক্তির কায়িক ও বাচনিক অলঙ্ঘনই অব্যতিক্রম শীল।

সীলেন সুগ্গতিং যন্তি সীলেন ভোগ সম্পদা
সীলেন নিব্বুতিং যন্তি তস্মা সীলং বিসোধয়ে।

(শীলবানেরা শীল পালনের দ্বারা স্বর্গে গমন করে ভোগ সম্পত্তি লাভ করে এবং নির্বানও লাভ করতে পারে। তাই শীলকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করবে)।

সাসনে কুলপুত্তানং পতিটঠা নত্থি যং বিনা
আনিসংস পরিচ্ছেদং তস্স সীলস্স কো বদে?

(যে শীল পালন ব্যতীত কুলপুত্রগণ বুদ্ধ শাসনে অটলভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না, সে শীল পালনের ফল কত যে মহত্তর তা কে নির্ণয় করে বলতে পারে?)

সমস্ত বুদ্ধ গণের মতে শীল নির্বান মহাসমুদ্রে অবগাহন তীর্থ স্বরূপ। মার সৈন্য মর্দ্দনেও শীলরূপ সৈন্য সদৃশ আর অন্য কোন সৈন্য নেই। তৃষ্ণা ছেদন কালেও শীলরূপ অস্ত্রই উত্তম, শরীরের শোভা বর্দ্ধনেও শীলাবরনই শ্রেষ্ঠ, জীবন রক্ষণে শীলরূপ কবচই অভেদ্য। শীলরূপ সম্বল অগ্র, শীলরূপ পাথেয় উত্তম, শীলরূপ বাহনই নিরাপদ যান। ইহলোকে শীল পালনই অগ্র, প্রজ্ঞা সাধনা উত্তম। তবে প্রজ্ঞার চেয়ে শীলের জয় প্রধান। (থের গাথা)।

সীল গন্ধো সমো গন্ধো কতো নাম ভবিস্সতি
যো সমং অনুবাতে চ পতিবাতে চ বাযতি।

(শীলগন্ধ সমান মনোরম গন্ধ আর কোথাও নাই, এই গন্ধ বায়ুর অনুকূলেও প্রতিকূলে সমানভাবে প্রবাহিত হয়)।

সগ্গারোহন সোপানং অঞ্ঞং সীল সমং কুতো?
দ্বারং বা পন নিব্বান নগবস্স পবেসনে।

(শীলই স্বর্গারোহনের একমাত্র সোপান। শীলের সমান আর কি আছে? এই শীলই নির্বান নগরে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ)।

ভাবনাঃ- ভাবনা শব্দের অর্থ জ্ঞান উৎপাদক চিন্তা, মনের কাজ। ত্রিতাপদগ্ধ মানবগণ চিত্তের একাগ্রতা সাধন নিমিত্তে যে পদ্ধতির কথা বলেছেন তাহাই ভাবনা।

বিক্খিত্ত চিত্তো নেকগ্গো সম্মা ধম্মং ন পস্সতি
অপস্সমানো সদ্ধম্মং দুক্খান পরিমুচ্চতি

(একাগ্রতাহীন, বিক্ষিপ্ত চিত্ত ব্যক্তির ধর্ম সম্যক দর্শন সম্ভব নয়। সদ্ধর্ম সম্যকরূপে অদর্শন হেতু তারা দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয় না।)

ভাবনা অর্থে উৎপাদন বা বর্দ্ধনও বুঝায়। যেমন যার প্রতি মৈত্রীভাব নাই তার প্রতি মৈত্রীভাব উৎপাদন করা, যার বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নাই তার বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা করা ইত্যাদি।

সতি পটঠান সুত্র মতে, ভাবনাকারীর চরিত্রানুযায়ী সতিপটঠান ভাবনা করতে হয়। চরিত্র ছয় প্রকার। যথা (ক) রাগ (তৃষ্ণা) চরিত্র, (খ) দ্বেষ (হিংসা) চরিত্র, (গ) মোহ (দৃষ্টি) চরিত্র, (ঘ) শ্রদ্ধা চরিত্র, (ঙ) বুদ্ধি চরিত্র ও (চ) বিতর্ক চরিত্র। রাগ চরিত্র মন্দ ব্যক্তির কাছে কায়ানুদর্শন, বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে বেদনানুদর্শন, মোহ যুক্ত ব্যক্তির কাছে ধর্মানুদর্শন।

চারভ্রান্তিঃ *শুভ, নিত্য, সুখ ও শুচি।*
চার ওঘ ও চার যোগঃ *কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যা,*
চার আসবঃ *কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টাসব ও অবিদ্যাসব,*
চার গ্রন্থিঃ *লোভ, হিংসা, শীলব্রত ও সত্যাভিনিবেশ,*
চার উপাদানঃ *কামউপাদান, দৃষ্টি উপাদান, শীলব্রত উপাদান ও আত্মবাদ উপাদান,*
চার অগতিঃ *তির্য্যক, প্রেত, নিরয় ও অসুর এই সমস্ত ধ্বংসের পক্ষে কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন ও ধর্মানুদর্শনই অনুকূল।*

কায়ানুদর্শন ঃ কায়া জীবিত হোক বা মৃত হোক অশুচি ও ঘৃনিত। এই কায়া পদতল হতে উর্ধ্বে এবং মস্তকের কেশ হতে অধঃ পর্যন্ত ত্বক দ্বারা পরিবেষ্টিত। কায়ার উৎপত্তি বিষয়ে, কায়ার অনিত্য স্বভাবে, কায়ার-অশুচি সম্বন্ধে এই কায়া "আমি" নহি, এই কায়া "আমার" নহে, এই কায়া আমার "আত্মা" ও নহে এ ভাবে কায়ানুদর্শী হয়ে স্মৃতিমান থাকা বাঞ্চনীয়।

বেদনানুদর্শন ঃ বেদনা অর্থ অনুভূতি। স্পর্শ হইতে বেদনা। সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা, উপেক্ষা বেদনা, শারীরিক বা মানসিক বেদনা ইত্যাদি অনেক ধরনের বেদনা বিদ্যমান। ইন্দ্রিয় ও আলম্বনের সংযোগে যে স্পর্শ হয় তা থেকেই বেদনার উৎপত্তি। সুখ বেদনার সময় লোভ চিত্ত, দুঃখ বেদনার সময় হিংসা চিত্ত, উপেক্ষা বেদনার সময় মোহ চিত্ত উৎপন্ন হয়। বুদ্ধবাদে উক্ত হয়েছে-

স্পর্শ হইতে হয় বেদনা সঞ্চার
চিত্ত যদি রমে থাকে বেদনা মাঝার।
অনুভূতি যাহাই হয় তাহাই বেদনা
কায় মনে বেদনার ইহাই বর্ণনা।

তাই এই রূপ ভাবনা করা উচিত যে, কোন বেদনাই "আমি" নহি, "আমার" নহে, আমার "আত্মা" নহে।

চিত্তানুদর্শন ঃ যাহা চিন্তা করে তাহাই চিত্ত। যে বিজ্ঞান দ্বারা শরীরের অভ্যন্তর ও বহির্দেশের বিষয় জানতে পারে, অবলম্বন ও বিবেচনা করে তাহাই চিত্ত। কুশল-অকুশল, সমহিত - অসমাহিত সর্ববিধ চিত্তই অনিত্য। কোন চিত্তই "আমি" নহি, "আমার" নহে, আমার "আত্মা" নহে। তাই সতত চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে স্মৃতিমান থাকা বাঞ্চনীয়। লোকনীতিতে উক্ত হয়েছে -

অনগত ভয় যদি দেখে বিজ্ঞগন
দূর হতে ত্যাজে তাহা নির্ভয় কারণ।
বর্তমান ভয় যবে উপস্থিত হয়
বিজ্ঞলোক দেখি তাহা কভু ভীত নয়।

ধর্মানুদর্শন ঃ ধারন করে অর্থে ধর্ম। নরকগতি প্রাপ্ত পাপী তাপীদিগকে কুশল আচরন দ্বারা রক্ষা করে বলে ধর্ম। ধর্ম পদে উক্ত হয়েছে -

ধর্মে যার অবস্থান, যিনি ধর্মে রত
পুনঃ পুনঃ ধর্ম -চিন্তা করেন সতত,
করেন যিনি নিয়ত ধর্মানুশীলন
সে জন সদ্ধর্ম হতে স্খলিত না হন।

"ধর্মানুদর্শন স্মৃতি প্রস্থান" সংজ্ঞা ও সংস্কার স্কন্ধেরই স্মৃতির অনুশীলন। সংজ্ঞা ও সংস্কার স্কন্ধের অনুশীলন করতে হলে - (ক) পঞ্চ নীবরন, (খ) পঞ্চ স্কন্ধ, (গ) দ্বাদশ আয়তন, (ঘ) সপ্ত বোধ্যঙ্গ ও (ঙ) চতুরার্য্য সত্য সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

ক. **পঞ্চ নীবরন ঃ** কাম ছন্দ, ক্রোধ, স্ত্যান মিদ্ব-চিত্ত চৈতসিকের জড়তা ও গ্লানি, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য -চিত্তের চঞ্চলতা ও অনুশোচনা এবং বিচিকিৎসা (সংশয়)।

খ. **পঞ্চ স্কন্ধ ঃ** নামরূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান।

গ. **দ্বাদশ আয়তন ঃ** অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি ও জরা-মরনাদি।

ঘ. **সপ্ত বোধ্যঙ্গ ঃ** স্মৃতি, ধর্ম-বিচয় (প্রজ্ঞা), প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা।

ঙ. **চতুরার্য্য সত্য ঃ** দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায়।

এই জগতে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম যারা লাভ করেছেন দানময়, শীলময় কুশল কর্ম নিত্যস্মৃতি পথে জাগরুক রাখা অতীব প্রয়োজন। এ ত্রিবিধ কুশল কর্ম মানুষকে পরম শান্তির পথে নিয়ে যায়।

বুদ্ধের শাসনে জন্ম করিয়া গ্রহণ
দুঃখকে করিয়া ভয়, মুক্তির কারন
বুদ্ধ বাণী অনুসারি দৃঢ় বীর্য্য বলে.....
প্রতিজ্ঞা করেন যোগী, কভু নাহি টলে। *-"বুদ্ধবাদ"*

বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম এবং বনভান্তে

আনন্দ প্রকাশ চাকমা

চীন, জাপান, মায়ানমার (বার্মা), থাইল্যাণ্ড, শ্রীলংকা প্রভৃতি বৌদ্ধ প্রধান রাষ্ট্র (Buddhist Countries) সমূহের মত বাংলাদেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায় (Buddhist) নিরঙ্কুশ না হলেও তার সংখ্যা কিন্তু নগন্য নয়। বাংলাদেশে ৬৪টি জেলার মধ্যে প্রত্যেকটিতেই কম বেশী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। কিন্তু (১) রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠ পোষকতার শীতলতা, (২) ভিন্ন ধর্মের আগ্রাসী প্রভাব, (৩) সুদক্ষ ধর্ম প্রচারকের সংখ্যা নগন্য, (৪) সদ্ধর্ম রীতি নীতি প্রতিপালনে ধর্মীয় বিধানের শিথিলতা, (৫) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি কারনে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের দৃশ্যমান প্রসারতা অনেকাংশে ম্লান বলা চলে। ঐতিহ্যগত দিক থেকে বিচার করলে বহু যুগের নিদর্শন স্বরূপ বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য বৌদ্ধ স্থাপত্য যেভাবে আবিস্কৃত হয়েছে অন্য কোন ধর্মের প্রতীক নিদর্শন তেমনটি মেলে নি। অনেক স্থানে পুরনো বৌদ্ধ কীর্তি সমূহ বর্তমানে ধ্বংসাবশেষে পরিনত হয়ে পড়েছে বা হতে বসেছে। যেমন- পাহাড় পুর, কাশীনগর, সারানাথ, কদলপুর, বড় মহামুনি, ছোট মহামুনি ইত্যাদি। বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তনের বয়স আজ প্রায় আড়াই হাজার বছরেরও বেশী কাল অতীত হতে চলেছে। আবিস্কারের বিচারে সনাতন ধর্মের পরেই বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবের মত শত বৎসর পরেই প্রবর্তীত হয়েছে। কিন্তু উপরে উল্লেখিত ৫টি সহ আরও নানাবিধ কারনে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের গতি কিছুটা যে মন্থর এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

বৌদ্ধ ধর্মটা বিজ্ঞান সম্মত, কর্মফল ও অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী। ত্রিপিটকের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মের যে ভাবে দিক নির্দেশনা সহ অনুশাসন ও রীতি নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে তা' দেশে দেশে যুগে যুগে অপরিবর্তীত ও পূর্ববৎ। জীবনের প্রতিটি দিক অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে পর্যবেক্ষন ও বিশ্লেষণ করে সঠিক পথ নির্দেশের পরও নিজ ধর্মের ক্ষেত্রে ভগবান বুদ্ধ বলেছিলেন -"এস, দেখ তার পরেই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহন কর।" অর্থাৎ দেখে, শুনে, বুঝে যদি নিজের গ্রহনযোগ্য হয় তারপরেই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করতে বুদ্ধ বলেছেন। না জেনে, না শুনে, না বুঝে- নয়। কাজেই জোর জবর দস্তি বা বাধ্যবাধকতার প্রয়োগ বৌদ্ধ ধর্মে রীতি সিদ্ধ নহে। তবে প্রকৃত বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে বুদ্ধ বা ত্রিপটক যথেষ্ট কঠোর, উন্নত ও বাস্তব বিধি-বিধান নির্দেশ করেছেন। সুতরাং একথা বলা দরকার যে, বৌদ্ধ ধর্মটা অত্যন্ত কঠিন, কঠোর, উন্নত ও জ্ঞানীর ধর্ম। ভাসা ভাসা

লৌকিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে এ ধর্মকে বুঝা বা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বুদ্ধ কাউকে মুক্ত করাবেন একথা বলেননি। তবে তিনি সকলের জন্য মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন। অন্যান্য ধর্মে স্বর্গ আর ব্রহ্মলোক লাভের কথা উল্লেখ থাকলেও নির্বান লাভের কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে নির্বান লাভের কথা বলা হয়েছে। তবে কর্মের ফলে নিজেই নিজের মুক্তির পথ প্রসস্ত করবে, অন্যের কর্মের উপর নির্ভর নয়।

দুঃখজনক হলেও অপ্রিয় সত্য যে, বৌদ্ধ ধর্মের অনুশাসন বিষয়ে সঠিক জ্ঞানের অভাবে বাংলাদেশে অনেক আনাড়ি ধর্মপ্রচারক ও দায়ক-দায়িকা বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক নীতি সমূহের অপব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ দায়ক-দায়িকার অনুভূতিতে বিভ্রান্তির বীজ বুনে থাকেন। অনেকে আবার ধর্মীয় নীতি সমূহকে নিজ স্বার্থের সুবিধামত অপব্যাখ্যা প্রদান করে বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক অনুশাসনকে তার নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে সরিয়ে এক একটি অদ্ভুত ঠিকানা নির্দেশ করেন। যেমন অনেক ভিক্ষু, স্থবির বা মহাস্থবির বিকালে ভোজন করে থাকেন। তাহলে দশ শীলে কেন লেখা রয়েছে "বিকাল ভোজন বেরমনী"? শীল একভাবে গ্রহণ করব আর একভাবে প্রতিপালন করব তাতো হতে পারে না। বুদ্ধ নির্দেশিত শীল সমূহ পূর্বে যেমন ছিল বর্তমানেও তেমন আছে এবং ভবিষ্যতেও একই থাকবে। তার ব্যতিক্রম হওয়া মানেই কৃত্রিমতা, অপ প্রয়োগ ও বিকৃতিকরণ। তার ব্যতিক্রম করা মানেই ধর্মীয় গাম্ভীর্যের উপর চরম আঘাত হানা। অনেকে সকালে বিকালে যে কোন সময় সংঘদান সম্পন্ন করেন। অনেক ভিক্ষু দায়কের সঙ্গে সম আসনে শয়ন, হাট - বাজারে বেচাকেনা, স্বহস্তে বাগ-বাগিচায় কাজকর্ম মহাজনী কারবার থেকে আরম্ভ করে স্বহস্তে মাছ-মাংস ক্রয় করে বিহারে ভোজন কার্য সম্পাদন করে থাকেন। এমনও দেখা যায় অনেক ভিক্ষু বর্ষাবাস অধিষ্ঠান করলে সপ্তাহ খানেক বা তারও বেশী কাল ধরে অধিষ্ঠিত বিহার ছেড়ে অন্যত্র বিচরণ করে থাকেন।

অন্যদিকে অধিকাংশ সাধারণ দায়ক-দায়িকা মুখে বৌদ্ধ দাবী করেন বটে কিন্তু বৌদ্ধ হিসাবে আচরণে সম্পূর্ণ হরিবোল। অনেক দায়ক-দায়িকার বাড়ীতে বেড়ায় টাঙানো থাকে বুদ্ধের ছবি। কিন্তু সেই বাড়ীতে করা হচ্ছে– কালীপূজা, শনিপূজা, লক্ষী পূজা, শিব পূজা, গঙ্গা পূজা, পাঠা বলি ইত্যাদি কত রকমের পূজাও প্রাণী নিধন যজ্ঞ। বসানো হচ্ছে মদ, জুয়া, গাঁজার আসর। অনেক প্রভাবশালী দায়ককে দেখা যায় তাঁরা ভিক্ষুদেরকে নিজের ইচ্ছা ও সুবিধামত চালনা করাতে চান। অনেকে করেন সংঘ ভেদ। বিহারের দান বাক্স চুরি থেকে আরম্ভ করে সংঘ মালামাল ভোগ, ভিক্ষুদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ, মাতাল অবস্থায় বিহারে আগমন, উচ্চ ডিগ্রী ও ধনের অহংকার ইত্যাদি দায়ক-দায়িকারাও কি না করেন? অনেকে শুধু কারণে-অকারণে ভিক্ষু সংঘ এবং উপাসক-উপাসিকাদের সমালোচনা করে বেড়ান। কিন্তু স্বশরীরে বিহারে গিয়ে কখনও কোন পূণ্য কর্ম সম্পাদন করেন না। তাহলে হিসাব করে দেখতে হবে পঞ্চশীল থেকে মোট কয়টি শীল দায়ক-দায়িকা কর্তৃক প্রতিপালিত হচ্ছে। অনেকে পঞ্চশীলকেও ঠাট্টা করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক নীতি সমূহের বিকৃতি ও ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের অবনতির পিছনে ভিক্ষু সংঘ এবং দায়ক-দায়িকা উভয়েই দায়ী। কারণ উল্লেখিত আচরণগুলি সবই বুদ্ধ প্রদর্শিত বিধানের বহির্ভূত। বৌদ্ধ হয়ে অবৌদ্ধের আচরণ করা স্বভাবতই ধর্মীয় মান পরিহানির নামান্তর।

সদ্ধর্মের মৌলিক আচার-আচরণ ও অনুশীলন সম্পর্কে ভিক্ষু সংঘ এবং দায়ক-দায়িকার অজ্ঞতা অথবা মিথ্যা দৃষ্টির কারণে উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশ অঞ্চলে মোঘল আমল থেকে

বৌদ্ধ ধর্মটা বলতে গেলে খুবই বিব্রতকর অবস্থার মধ্য দিয়ে চলে আসছে। মহা কারুনিক বুদ্ধ প্রদর্শিত ধর্মীয় মূল আদর্শকে বিকৃত করে এক শ্রেণীর মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন অপপ্রচারক যখন একান্ত নিজের সুবিধামত অপব্যাখ্যা দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মকে তার সঠিক অবস্থান থেকে সরিয়ে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করার হীন চেষ্টায় মত্ত ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে বৌদ্ধ ধর্মের উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা স্বরূপ এ বাংলাদেশে যাঁর ঐতিহাসিক আবির্ভাব তিনিই হচ্ছেন পরম শ্রদ্ধাভাজন আর্যপুরুষ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির যাঁর এক পরিচিত নাম বনভান্তে। বলতে গেলে তিনিই একমাত্র পুরুষ যিনি বাংলাদেশে কুপ্রভাবিত বৌদ্ধ ধর্মকে রাহুমুক্ত করে আবার প্রাণ চাঞ্চল্য দান করতে সক্ষম হয়েছেন। ষাটের দশকে তাঁর আবির্ভাব না ঘটলে এতদিনে এ দেশে বৌদ্ধ ধর্মের আরো চরম অবনতি ঘটতো বলা যায় নিঃসন্দেহে। কোন কোন স্থানে তিনি স্বয়ং যেতে না পারলেও শিষ্য মন্ডলী দ্বারা বুদ্ধ শাসনকে উজ্জীবিত করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বৌদ্ধ ধর্মের অনেক অজ্ঞাত বিষয় আমরা তাঁর মাধ্যমে জানতে ও বুঝতে সক্ষম হচ্ছি।

তবে অপরিনামদর্শী ও পরশ্রীকাতর সমালোচকদের কতিপয় ভিত্তিহীন সমালোচনা তিনি এড়াতে পারেননি। হরেক রকম সমালোচক হরেক রকম সমালোচনা করে থাকেন। অনেকে অভিযোগ করে বলেন, বনভান্তে এবং তাঁর শিষ্য বর্গের মধ্যে সংঘ ভেদ মানসিকতা বিদ্যমান। কারণ তাঁরা নাকি কোন অনুষ্ঠানে বনভান্তের শিষ্য মণ্ডলী ব্যতীত অন্য ভিক্ষু আমন্ত্রিত হলে সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বা উপস্থিত হতে অনীহা প্রকাশ করেন। সেই অপবাদের প্রেক্ষিতে ইহা তুলে ধরতে হচ্ছে যে; সংঘ ভেদ নয়, আচরণ ও অনুশীলন গত পার্থক্যই এখানে প্রধান। বিশেষ করে দানীয় বস্তুর প্রতি "লোভ" এবং "নির্লোভ" মূখ্য। কথায় বলে "সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে"। যেখানে দানীয় বস্তুর মত একটা সামান্য বিষয় নিয়ে যদি ভিক্ষু সংঘের মধ্যে বাগ-বিতণ্ডা, বাক্যবান ছুড়া, মুখ ঘুরিয়ে বসা ইত্যাদি হাস্যকর আচরণ দায়ক-দায়িকার সম্মূর্খে করা হয় তাহলে তা ধর্মীয় গাম্ভীর্যের উপর চরম পরিহানিকর আঘাত দেয়া নয় কি? সুতরাং ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক সে রকম হাস্যকর ক্রিয়া সম্পাদিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সদ্ধর্ম আচরণকারী ভিক্ষুকে সেই অনুষ্ঠান থেকে যোগ দানে বিরত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

নিজের সুবিধামত না হলে মানুষ ভগবানকেও দোষারোপ করে থাকে। ইহা অসার বাক্য ক্ষয় ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই বনভান্তে বা তাঁর শিষ্য মন্ডলীকে যে যেভাবে সমালোচনা করুক না কেন; একথা স্বীকার করতে হবে যে, বনভান্তের আবির্ভাব না ঘটলে বাংলাদেশে এত দিনে বৌদ্ধ ধর্মের অনেক অনেক মৌলিক নীতি সুবিধা বাদীদের কবলে পড়ে চরম ভাবে বিকৃত হয়ে পড়তো। ধর্মের উপর আসতো কুঠারাঘাত। এ শতাব্দীতে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের এহেন সমুজ্জ্বলতার মুলে বনভান্তের সাধনা ও নিরলস প্রচেষ্টাই মূখ্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছে বলে আমাদের এক বাক্যে স্বীকার করতে হবে। সদ্ধর্ম রক্ষা ও বিকাশের ক্ষেত্রে পৃথিবীর বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে শ্রদ্ধেয় বনভান্তের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

আর্যগনের দর্শন শুভজনক, সর্বদা তাঁহাদের সান্নিধ্য লাভ সুখপ্রদ।
মুর্খগনের অদর্শনে মানুষ সততই সুখী হইয়া থাকে। *–"ধম্মপদ"*

বৌদ্ধ ধর্মে শ্রদ্ধা

শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি

বাংলা অভিধানে শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ সাদর সম্মান, ভক্তি, দৃঢ় প্রত্যয়, আস্থা, বিশ্বাস, নিষ্ঠা ইত্যাদি। বৌদ্ধ সাহিত্যে শ্রদ্ধার অর্থ ব্যাপক বিস্তৃতে। এখানে সাধারণ বিশ্বাস বিতাড়িত হয়ে তার স্থানে জ্ঞানযুক্ত, যুক্তিসঙ্গত সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস বা পরোক্ষ জ্ঞানের নামই শ্রদ্ধা। অর্থাৎ প্রজ্ঞা সহযোগে যথাযথ পর্যবেক্ষণ দ্বারা যে আস্থা বা বিশ্বাস স্থাপন হয় তা শ্রদ্ধা। একজন রোগীর যেমন দক্ষ, অভিজ্ঞ ডাক্তারের প্রতি, শীত-গ্রীষ্মের প্রকোপ উপদ্রবের হাত থেকে রক্ষার জন্য এয়ার কণ্ডিশনের উপর এবং কাঁদাযুক্ত স্থান পায়ে হেঁটে যেতে জুতার উপর পরীক্ষিত আস্থা বা বিশ্বাস থাকে; সেরূপ বৌদ্ধরাও বুদ্ধের আবিষ্কৃত মহাসত্য পরকাল, কর্মফল, চারি আর্য্য সত্যের প্রতি দৃঢ় আস্থাশীল বা বিশ্বাসবান। তবে বৌদ্ধগনের পরকাল তথা চারি আর্য্য সত্যের উপর আস্থা কখনো এরূপ নয় যে, ঐ আস্থার পুরস্কার স্বরূপ তারা আপনা-আপনি সমস্ত অকুশল পাপ থেকে মুক্ত হবে বা দুঃখ মুক্তি ঘটবে তাদের।

তাহলে প্রশ্ন হতে পারে বৌদ্ধ ধর্মের জ্ঞানযুক্ত শ্রদ্ধা কিরূপ? উপমা- কোন একজন পথিক অপরিচিত একটি রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে এক নাতিক্ষুদ্র খাল তীরে এসে থেমে গেল। কারণ, খালে খেয়া নৌকা কিংবা সেতু কোনটিই নেই। পথিক পড়ে গেল বিপদে, কি করে খাল পার হবে? তাকে তো খাল পাড়ি দিয়ে গন্তব্য স্থানে যেতে হবে। ইত্যোবসরে পথিকের দৃষ্টিগোচরে ধরা পড়ল খালের অপর পারে একজন ভদ্রলোক বৃক্ষছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছে। পথিক ভদ্রলোকটিকে ডেকে খাল পার হবার উপায় জিজ্ঞাসা করলে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন 'পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায়, কাপড় ভিজবে না, আমিও কিছুক্ষণ আগে পার হয়ে বিশ্রাম করতেছি'। পথিক চিন্তা করতে লাগল ভদ্রলোকটির কথা সত্য (বিশ্বাসযোগ্য) কিনা? খাল অবলোকন করে দেখল খালের দুই দিকের ক্রমিক রাস্তাটি যদিও খাল দ্বারা বিচ্ছিন্ন কিন্তু উভয় সৈকতে পথিকগণের চলাচলের পদচিহ্ন আছে। সুতরাং ভদ্রলোকটির কথা মিথ্যা হবার কোন কারণ নেই। এরূপ সিদ্ধান্ত করে পথিক পায়ে হেঁটে অগ্রসর হতে লাগল এবং প্রতি পদক্ষেপে সতর্ক অবলম্বন করে চলতে চলতে নিরাপদে ওপারে উত্তীর্ণ হল। এখানে পথিক ভদ্রলোকটির কথা অন্ধভাবে বিশ্বাস করেনি, যথাসম্ভব বিচার (পরিক্ষা-নিরীক্ষা) পূর্বক বিশ্বাস করতঃ সাবধানে খাল পার হয়েছে। খাল পার আরম্ভ হবার সময় এবং খালের মধ্যভাগে অগ্রসরের সময় তার বিশ্বাস ক্রমান্বয়ে বশবর্তী হয়, আর ওপারে উত্তীর্ণের পর বিশ্বাসের কোন ঘাটতি ছিল না। ঠিক তেমনিভাবে অনুমান ভিত্তিতে বিশ্বাস না করে বুদ্ধের ভাষিত সৎকর্মাদি আচরণে পরীক্ষিত সৎফল লাভে যে প্রীতিযুক্ত দৃঢ় বিশ্বাসের উদয় হয় তাই বৌদ্ধধর্মে জ্ঞানযুক্ত শ্রদ্ধা।

স্বচ্ছ অবিক্ষুব্ধ পানিতে যেমন চন্দ্র-সূর্য্যের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় তেমনি বুদ্ধাদি সৎপুরুষ দর্শনে শ্রদ্ধার উৎপত্তি হয় বা শ্রদ্ধা নির্ম্মল চিত্তেই পরকাল, কর্মফল ও বুদ্ধাদি শ্রদ্ধেয় বস্তু গৃহীত হয়। যেমন কোন দুইবন্ধু পর্বত আরোহন উদ্দেশ্যে হাতে হাত ধরে এগুতে এগুতে পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হল। পাদদেশে এসে প্রথম বন্ধু দ্বিতীয় বন্ধুকে বলল বন্ধু, আমি বেশ ক্লান্ত

হয়েছি, তুমি একা পর্বতের উপরিভাগে আরোহন পূর্বক আমাকে (উপর হতে যা দেখা যায়) তার বর্ণনা বলবে। কথামত দ্বিতীয় বন্ধু পর্বতের উপরে উঠে বলতে লাগল, বন্ধু আমি এখান থেকে সুন্দর দৃশ্য, যথা রমনীয় ভূমি, রমনীয় বন, রমনীয় পাহাড়, রমনীয় ঘর, রমনীয় পুষ্করিনী দেখতেছি। কিন্তু নীচে দণ্ডায়মান প্রথম বন্ধু তাতে বিশ্বাস জন্মাতে পারল না। তখন দ্বিতীয় বন্ধু পর্বতের নীচে নেমে এসে প্রথম বন্ধুকে বাহুতে ধরে পর্বতের উপরিভাগে নিয়ে গেল এবং বলল এবার তুমি কি রকম দেখতেছ? এভাবে প্রথম বন্ধু দ্বিতীয় বন্ধুর কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করল। আরো বলা যায়, বালক আইজ্যাক নিউটন একদিন তাদের বাগানে একটি পাকা আপেল মাটিতে পড়তে দেখে সাথে সাথে তার মনে এরূপ কৌতূহলীভাব উদয় হল– 'আচ্ছা আপেলটা মাটিতে (নীচে) এসে পড়ল কেন? উপরের দিকেতো উঠতে পারত, তা হলো না কেন? নিশ্চয় এর পিছনে কোন গোপন রহস্য আছে'। আপেলের সেই পতন রহস্য বা কৌতূহলভাবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে যেতে তিনি আবিষ্কার করে ফেললেন বিজ্ঞান জগতে বিপ্লব ঘটান 'মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব'। ধরা যাক জেম্‌স্ ওয়াটের স্টীম ইঞ্জিনের আবিষ্কারের কথা। তিনিও ছোটবেলায় উত্তপ্ত পানিতে কেটলির ঢাকনা খুলে গিয়ে বাষ্প বের হতে দেখে কৌতূহলী হন। 'কে কেটলির ঢাকনা খুলে? কি করে শক্ত ঢাকনাটা খুলে যাচ্ছে'? জেম্‌স্ কয়েকবার কেটলির ঢাকনা ঢেকে দেয়, কিন্তু তাতেও একই ফল অর্থাৎ বাষ্পের ধাক্কায় খুলে গিয়ে অবিরাম বাষ্প বের হতে থাকে। সেদিনের সে দৃশ্য থেকে জেম্‌স্ প্রমাণ করলো বাষ্পের শক্তি আছে। আর, বাষ্পের সে শক্তিকে গবেষণা চালিয়ে আবিষ্কার করেছিলেন স্টীম ইঞ্জিন। যা মূলতঃ বাষ্পের শক্তিতে (চাপে) চালিত হয়। অনুরূপভাবে, বৌদ্ধ ধর্মেও চোখের সামনে নিত্যদৃশ্যমান যথা- অল্পায়ু, দীর্ঘায়ু, কঠিন ব্যাধিগ্রস্থ-নিরোগী, বিশ্রী-সুশ্রী, বন্ধুবান্ধবহীন দরিদ্র-মহাপরিবার সম্পন্ন ধনী, অল্পভোগ সম্পদক্ষমতাহীন-ভোগসম্পদ সম্পন্ন মহাপ্রভাবশালী, নীচবংশীয়-উচ্চবংশীয়, নির্বোধ-প্রজ্ঞাবান, এরূপ হীন শ্রেষ্ঠের প্রভেদ দেখে পরকাল, কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস, এবং দুঃখ (জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণ-অপ্রিয় সংযোগ-প্রিয় বিয়োগাদি দুঃখের অস্তিত্ব), দুঃখ সমুদয় (অবিদ্যা, তৃষ্ণা), দুঃখ নিরোধ (আগুন যেমন আছে তার নির্বাপক পানিও আছে তদ্রূপ শমথ বিদর্শন দ্বারা দুঃখ নিরোধ হয়), দুঃখ নিরোধের পথ (আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ) বিদ্যমানতা দেখে চারি আর্য্য সত্যকে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা করতে উপদেশ দেয়া হয়। বলা যায়, এরূপ বাস্তব উপলদ্ধিতে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের উৎপত্তি আর সে শ্রদ্ধার ফলে অকুশল ত্যাগ করে কুশল পথ অবলম্বন ও চারি আর্য্য সত্যে জ্ঞান লাভ করে নির্বান সুখ প্রত্যক্ষ করতে অনুপ্রেরণা জন্মে হৃদয়ে।

বৌদ্ধ ধর্মে চিত্তের নির্ম্মলতা ও উচ্চাকাঙ্খাকে শ্রদ্ধার লক্ষণ বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্থবির নাগসেন বলেছেন চিত্তের প্রসন্নতা সাধন ও উৎসাহ উৎপাদন শ্রদ্ধার লক্ষণ চিত্তে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হলে নীবরণ (বাঁধা) সমূহ বিদূরীত হয়, নীবরণহীন চিত্ত স্বচ্ছ, প্রসন্ন ও নির্মল হয়। এরূপেই চিত্তের প্রসন্নতা সাধন শ্রদ্ধার লক্ষণ। শ্রদ্ধাকে চক্রবর্তী রাজার জল বিশুদ্ধকারক মণির সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই বিশেষ মনি যখন জলে নিক্ষেপ করা হয় তখন জলের শৈবাল বা শেওলা, কাঁদা তলিয়ে যায়। তৎপর জল বিশুদ্ধ হয়। অনুরূপভাবে শ্রদ্ধা মনের অবিমলতা বিশুদ্ধ করে, নীবরণমুক্ত চিত্ত স্বচ্ছ, প্রসন্ন ও প্রশান্ত হয়।

কোন যোগী অপর সাধকদের চিত্তকে বিশুদ্ধ বা বিমুক্ত দেখে স্বয়ং স্রোতাপত্তি ফল, সকৃদাগামী ফল, অনাগামী ফল কিংবা অর্হত্ত্ব ফলের জন্য আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হয় এবং অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অনুপলদ্ধের উপলদ্ধির নিমিত্ত, অপ্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষের নিমিত্ত প্রযত্ন করেন, আত্মনিয়োগ করেন। এরূপেই শ্রদ্ধা চিত্তে উৎসাহ উৎপাদন করে।

অভিধর্ম্মে শ্রদ্ধাকে শোভন চৈতসিক বলা হয়। কারণ কুশল বা শোভন কর্ম সম্পাদনে শ্রদ্ধার ভূমিকা অগ্রগণ্য। শ্রদ্ধার দ্বারা পঞ্চনীবরন (কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, তন্দ্রালস্য, চঞ্চলতা, অনুশোচনা, সন্দেহ) নিবৃত্ত থাকে। চুম্বক যেমন নিজের চতুর্দিকের ছোট বড় সকল লৌহকে আকর্ষণ করে থাকে, সেরূপ শ্রদ্ধাও চিত্তকে বুদ্ধের উপদেশে নমিত করে। শ্রদ্ধা দানাদি যাবতীয় পূণ্যক্রিয়ার চেতনা জাগায়। হস্ত বিহীন ব্যক্তি যেমন রত্নাদি দর্শন করলেও তা গ্রহণ করতে অক্ষম, বিত্তহীন

যেমন ভোগসুখ লাভে বঞ্চিত, বীজহীনের যেমন শস্যাদি লাভ হয়না, তেমনি শ্রদ্ধা না থাকলে কোন কুশলকর্ম সম্পাদন করা যায় না। সুতরাং কুশল কর্মের আদিভূমি হল শ্রদ্ধা। শীলবানকে দর্শনের ইচ্ছা, সদ্ধর্ম শ্রবণের ইচ্ছা এবং যাবতীয় অকুশল পাপ ময়লা ত্যাগের ইচ্ছাই শ্রদ্ধা। অশ্রদ্ধা ইহার প্রতিপক্ষ। শ্রদ্ধা আধিক্য হলে অশ্রদ্ধার আক্রমণে অকম্পিত থাকে। শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধাকে সংগ্রামের মাধ্যমে পরাভূত করে সম্প্রযুক্ত চিত্ত চৈতসিকের প্রসন্নতা আনয়ন করে থাকে। তদ্ধেতু ভগবান বুদ্ধ আলবক যক্ষকে বলেছিলেন শ্রদ্ধারূপ বিত্তই মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ (ধন)। 'সদ্ধায দরদি ওঘং'– সুদক্ষ নাবিক যেমন প্রবল ঝড়ো বাতাসের মধ্যেও আপন স্টীমারের সাহায্যে সমুদ্র স্রোত অতিক্রম করে নির্বিঘ্নে গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে সক্ষম, সেরূপ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিও সংসারের শত সহস্র আপদ বিপদের মাঝেও নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে সংসার স্রোত অতিক্রম করে আপণ লক্ষ্যপথে অগ্রসর হন।

বুদ্ধের প্রচারিত নৈবানিক ধর্মে 'দুঃখ মুক্তি নির্বান লাভ করা সম্ভব' এরূপ জ্ঞানযুক্ত ঐকান্তিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সারিপুত্র, মোদ্‌গলায়ন প্রমুখ অসংখ্য কুলপুত্র বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হয়ে নির্বান সুখ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাদের সেই শ্রদ্ধা অন্ধভাবে জাত বিশ্বাস নয়; যথাযথ পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে উৎপন্ন জ্ঞান সহগত বিশ্বাস বা আস্থা। যেমন শষ্য লাভার্থী কোন কৃষক উর্বর জমির উপর আস্থা রেখে তার সংরক্ষিত বীজ বপন করে সোনার ফসল ফলায়। মাটির অভ্যন্তরের স্তরে পানি থাকে তা জেনে যেমন টিউবওয়েল বসানো হয় তেমনি প্রজ্ঞাশাসিত এ শ্রদ্ধা ভব অন্ধকার বিনাশের প্রধান আলোক বর্তিকা স্বরূপ। শ্রদ্ধা একদিকে যেমন লৌকিক কুশলের মূল, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক উন্নতি বা জীবন উত্তরণের পাথেয়। শ্রদ্ধাধিক্য চিত্তে মিথ্যাদৃষ্টি অবসান হয়, সম্যক দৃষ্টি বর্দ্ধিত হয় এবং প্রজ্ঞা লাভ হয়, বৃদ্ধি পায়, বহুলীকৃত হয়।

অঙ্গুত্তর নিকায়ে বুদ্ধ বলেছেন– হে ভিক্ষুগণ! তিনটি গুণাবলীর দ্বারা শ্রদ্ধাবানকে জানা যায়। সেগুলো কি কি? সে শীলবানকে দর্শন করতে ইচ্ছা করে, সদ্ধর্ম শ্রবণ করতে ইচ্ছুক হয়; বিগতমল অন্তরে সে গৃহে বাস করে, একজন উদারহস্ত, পরিচ্ছন্ন হস্ত দানে প্রসন্ন অনুকূল যাচ্‌নাকারী, অন্যদের সাথে দান বিভাগ করে পরিভোগচ্ছুক। হে ভিক্ষগণ, এই ত্রিগুণের দ্বারা একজন শ্রদ্ধাবানকে জানা যায়।

পরিশেষে আবারো বলতে হয়, বৌদ্ধধর্মের শ্রদ্ধা না জেনে, না দেখে, না বুঝে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা বিশ্বাস নয়। তা নিজ বিবেকের কষ্ঠি পাথরে ঘষে যাচাই করতঃ বাস্তব সত্য উপলদ্ধি জ্ঞানযুক্ত বিশ্বাস। এখানে জ্ঞান ও বিচার বিহীনভাবে অন্ধ বিশ্বাসের কোন স্থান নেই, স্থান নেই আবেগজনিত অনিয়ন্ত্রিত অতিভক্তির (শ্রদ্ধার) আতিশয্যও। অতিভক্তি (বা শ্রদ্ধা) এমন আবেগে আন্দোলিত যে বাস্তব সত্যতা যাচাই এবং যুক্তি দ্বারা সত্য প্রমাণ করার সময়টুকু অপেক্ষা করতে পারে না। তাই অতিভক্তি কখনো শ্রদ্ধা নয়, তা অধিমোক্ষ বা দ্বিধাহীন ভাব মাত্র। যাকে মূর্খ ব্যক্তিরা গোঁড়ামী বা একগুয়েমী ভাব প্রকাশ করার সাথে তুলনা করা যায়। বৌদ্ধধর্মের শ্রদ্ধা কিন্তু ঐরূপ মনের সংকীর্ণতা দূর করে প্রীতিপূর্ণ জ্ঞানমূলক বিশ্বাস উৎপন্ন করে। যা বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা স্বাধীন মননশীলতা বিকাশের পূর্ণ প্রতীকস্বরূপ। বৌদ্ধধর্মের মত হল, সবসময় জ্ঞানযুক্ত বিচার, বুদ্ধি প্রয়োগ করবে, অন্ধ বিশ্বাস দিয়ে বা অন্ধ বিশ্বাসের বশীভূত হয়ে কোন কাজ করবে না। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ দ্বারা যা জানা গেল, দেখা গেল তাকে জ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে বিচার করতে হবে। যা দৃষ্ঠ ও বুদ্ধিগ্রাহ্য তাকে ঘটনা পরম্পর দ্বারা বিশ্লেষণ করলে জ্ঞানজাত বাস্তব সত্যোপলদ্ধি হয়। তাই শুধু ঘটনা পরিচয় লদ্ধ অভিজ্ঞতাই নয়, ঘটনার পেছনে কোন কারণ ও পরিস্থিতি সক্রিয় ছিল (বা আছে) তা বিচার্য বিষয়। এজন্য বৌদ্ধ ধর্মের শ্রদ্ধা কাউকে তাড়াহুড়ো, হুজুগবশতঃ ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হতে বা বিশ্বাস স্থাপন করতে বলে না। এ ধর্ম অন্ধ বিশ্বাসী মৌলবাদের হিংস্র থাবা মুক্ত ধর্ম।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

চিত্তের নির্মলতা, উচ্চ আকাংখাই শ্রদ্ধার লক্ষন। *– "বনভান্তে"*

সদ্ধর্ম্ম অনুসন্ধানে দুঃখ মুক্তি

শ্রীমৎ দেবানন্দ ভিক্ষু

রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

তথাগত ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ বলেছেন ত্রিলোকের সত্ত্বগণ অবিদ্যার কারণে সদ্ধর্ম্ম সম্বন্ধে সন্দিহান হয়। তাঁরা সদ্ধর্ম্ম কি তা বুঝেন না এবং পর ধর্ম কি তাও বুঝেন না। নিম্নে সদ্ধর্ম্ম এবং পর ধর্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

প্রথমে সদ্ধর্ম্ম কি? বুদ্ধ বলেছেন প্রকৃত সদ্ধর্ম্ম আচরণে চির সুখ এবং দুঃখ মুক্তি লাভ সম্ভব। যে ধর্ম আচরণে লোভ, দ্বেষ, মোহ ও মিথ্যাদৃষ্টি, পরিহার হওতঃ অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ ও সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে অবস্থান করা যায় এবং যেখানে চিরশান্তি তথা দুঃখ নিরোধ বা দুঃখের অবসান হয় ইহাই সদ্ধর্ম্ম।

দ্বিতীয়ত পর ধর্ম কি? যে ধর্ম আচরণ করলে লোভ, দ্বেষ, হিংসা, অজ্ঞান অহংকার ও মিথ্যাদৃষ্টি অন্তরে সংযোগ হয়ে দুঃখ পূর্ণ অন্তরে অবস্থান করতে হয়; যে ধর্ম কুশল কাজে বিঘ্নকারক এবং যা আচরণে সদ্ধর্ম্মের আস্বাদ কোন দিন ধারণার সহিত কাজ সম্পাদন করলে অনেক অকুশল বা পাপ সঞ্চয় হয়ে থাকে। আর এ ধর্ম দ্বারা মানুষ কখনো চির সুখী বা দুঃখ অবসান করতে পারে না।

প্রত্যেক মানুষ সুখ আকাঙ্খী, দুঃখকে কেউ কোনদিন কামনা বা আরাধনা করে না। মানুষ বিপদে পরলে তা হতে মুক্তি বা সুখ পাবার আশায় কত কিছুর আশ্রয় নিয়ে থাকে তার ইয়ত্তা নেই। যেমন- ডাক্তার, বৈদ্য, কবিরাজ, দেবতা, ভূত-প্রেত, পাহাড়-পর্বত, গাছতলা। আর কেউ রাজদন্ডে দন্ডিত হলে উকিল, ব্যারিষ্টার ইত্যাদি সহ কত কিছুর না আশ্রয় নেয়। চাকমাদের মধ্যেও আপদ-বিপদ, অসুখ-বিসুখ হতে ত্রাণ লাভের আশায় কতগুলি কুসংস্কার রীতি-নীতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন- শিব পূজা, থান্মানা পূজা, গাঙ পূজা, মাধা ধনা ইত্যাদি। কিন্তু এসব উপায়ে প্রকৃত ত্রাণ লাভ হয় না। বৌদ্ধ ধর্ম হচ্ছে কর্মবাদী ধর্ম।

এ ধর্ম মতে, যে রকম কর্ম করবে সে রকম ফল ভোগ করবে। তাই কুশল কর্ম সম্পাদনই প্রকৃত নিরাপদ আশ্রয়। আর সেরূপ কর্ম সম্পাদন করা প্রত্যেকের একান্ত করণীয় এবং অকুশল কর্ম সর্বদা পরিত্যাজ্য।

বুদ্ধ বলেছেন, সমস্ত অকুশল আশ্রয়, যেমন- পশুবলি যজ্ঞ, মিথ্যা দৃষ্টি মূলক পূজা, কুসংস্কার রীতি-নীতি পরিহার করে দান যজ্ঞ, শীল যজ্ঞ, ত্রিশরণ যজ্ঞ করাই উত্তম আশ্রয় এ সব উত্তমযজ্ঞে প্রকৃত আশ্রয়, প্রকৃত মঙ্গল এবং দুঃখ মুক্তি লাভ হয়। যারা জ্ঞানী ব্যক্তি তারা অপ্রমত্ত হয়ে বিপুল সুখের আশায় স্বল্প সুখ অবশ্যই পরিহার করবে।

দুঃখের হেতু বা কারণ কি? তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ বলেছেন অবিদ্যা, তৃষ্ণা দুঃখের মূল উৎপত্তির কারণ। ইহা ধ্বংসের একমাত্র পন্থা চারি আর্য সত্য জ্ঞান ও আসবক্ষয় জ্ঞান। এই জ্ঞানের দ্বারাই দুঃখের সাগর অতিক্রম করা সম্ভব। যতক্ষণ পর্যন্ত এ জ্ঞান উৎপত্তি বা আয়ত্ব করা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সত্ত্বগণের দুঃখের সাগরে ভাসমান অবস্থায় থাকতে হবে। বুদ্ধের মতে প্রত্যেকের সে চারি আর্য সত্য সম্বন্ধে এবং কর্মফল সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। তা-না হলে কারোর পক্ষে দুঃখ মুক্তি বা সংসার অতিক্রম করা সম্ভব পর নয়।

চারি আর্য সত্য কি? দুঃখ আর্য সত্য, দুঃখ সমুদয় আর্য সত্য, দুঃখ নিরোধ আর্য সত্য ও দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্য সত্য।

দুঃখ আর্য সত্য কি? দুঃখ আর্যসত্য প্রকৃত পক্ষে পঞ্চ স্কন্ধকেই বুঝায়। এই দুঃখ আর্যসত্যকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলে নিম্নরূপ হয়। যেমন ঃ- জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, ইপ্সিত বস্তুর অলাভ জনিত দুঃখ, সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধই দুঃখ।

জন্ম দুঃখ কি? যে কান যোনিতে সত্ত্বগণের প্রতিসন্ধি গ্রহণ করাই জন্ম দুঃখ। বুদ্ধ বলেছেন মাতৃকুক্ষিতে থাকাকালীন যে দুঃখ ভোগ করতে হয় তা (এক প্রকার) লৌহকুম্ভী নরকের সদৃশ।

জ্বরা দুঃখ কি? জন্মের পরই জ্বরা অবশ্যম্ভাবী, জীর্ণতা, বার্ধক্য, ইন্দ্রিয় পরিপক্কতায় সত্ত্বগণ জ্বরা দুঃখে জর্জরিত। তাদের উঠা-বসায়, চলা-ফেরায়, যে কষ্ট ভোগ করতে হয় তা বর্ণনা করা কঠিন। এভাবে জ্বরা দুঃখে সত্ত্বগণ নানাবিধ কষ্ট ভোগ করতে থাকে। এটাও এক প্রকার নরক দুঃখের ন্যায় দুঃখ বটে।

ব্যাধি দুঃখ কি? মানুষ জন্ম হওয়ার সাথে সাথে নানা প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যে দুঃখ ভোগ করে তা ব্যাধি দুঃখ। সচরাচর চোখের সামনে যে (সমস্ত) ব্যাধি দৃষ্টিগোচর হয়, যেমন- ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ক্যান্সার, যক্ষ্মা, বহুমূত্র, কুষ্ঠরোগ, মাথা ব্যথা, বাতরোগ, আটু, অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ ইত্যাদি। এসব রোগে সত্ত্বগণের যে দুঃখ ভোগ করতে হয় তা বর্ণনা করা দুরূহ ব্যাপার ইহা ব্যাধি দুঃখ।

মরণ দুঃখ কি? জন্মিলে মৃত্যু হবে। তাই প্রাণিগণের মৃত্যু অনিবার্য। বুদ্ধ বলেছেন মৃত্যুকে সকলে ভয় পায়, সংসার অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী। যেখানে উৎপত্তি আছে সেখানে বিলয় বা ধ্বংস ও থাকবে। সুতরাং মৃত্যুকে কেহ এড়িয়ে যেতে পারে না। একদিন না একদিন সবাইকে মৃত্যুর শীতল হাতের স্পর্শে পরপারে যেতে হবে- ইহা মরণ দুঃখ।

মৃত্যু পাঁচ প্রকার। যথাঃ
১। সমুচ্ছেদ মরণ– অর্হৎ গনের মৃত্যু।
২। ক্ষণিক মরণ– সংস্কারসমূহের সেই ক্ষণ ভঙ্গুরতা দৃষ্ট হয়।
৩। সম্মতি মরণ– বৃদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু হলে।
৪। কাল মরণ– পূণ্য ও আয়ুক্ষয়ে মৃত্যু হলে। ও
৫। অকাল মরণ– আকস্মিক বা তাৎক্ষণিক ভাবে মৃত্যু হলে।

সমুচ্ছেদ আর কাল মরণ ব্যতীত সব মরণ ভয়ংকর দস্যু সদৃশ। অন্যান্য ভাবে মরণ বা মৃত্যু কালে সত্ত্বগণ লোভ, হিংসাচিত্তে এবং অজ্ঞান মরতে পারে বটে। লোভ চিত্তে মৃত্যু হলে প্রেতলোকে আর হিংসা চিত্তে মৃত্যু হলে নরকে গমন করে। এবং অজ্ঞান অবস্থায় মৃত্যু হলে পশুপক্ষী কূলে জন্ম ধারণ করে। তাই তারা মৃত্যুকে ভয় পায়। কিন্তু (সমুচ্ছেদ) অর্হৎগণ মৃত্যুকে জয় করেন। তাই তারা কখনো মৃত্যু ভয়ে কম্পিত হন না। আর কালমরণকারীরা মৃত্যুর পর স্বর্গে কিংবা শ্রেষ্ঠ মানব কুলে জন্ম গ্রহণ করে, তাই তারা ও মৃত্যুতে তেমন ভয় পায় না।

অপ্রিয় সমাগম বা সংগোগ দুঃখ কি? যিনি অপরের বিরক্ত কারক, অনিষ্ট, অহিত, অমঙ্গল, দুঃখ কামনাকারী, দুশ্চরিত্র, দুঃশীল, পাপী, নরাধম ইত্যাদি ভাবে অপ্রিয় ব্যক্তি যাকে দেখলেও ভাল

লাগেনা তবুও তার সাথে দেখা সাক্ষাত মেলা-মেশা করতে হয় এবং তাতে মনে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় ইহা অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ।

প্রিয় বিয়োগ দুঃখ কি? প্রিয় বিয়োগ দুঃখ হচ্ছে ঈষ্ট কান্ত মনোজ্ঞ মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রিয় ব্যক্তি হতে বিদায় বা বিচ্ছেদ হওয়াই প্রিয় বিয়োগ দুঃখ। উদাহরণে বলা যায় যেমন– একজন জনদরদী খুব ভাল চরিত্রের লোক অথবা জননন্দিত কোন মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট এর অকাল মৃত্যুতে জন সাধারণের অন্তরে যে দুঃখ দৌর্মনস্যভাব, উপায়াস, পরিদেবন, হাহুতাশ, শোকের জন্ম হয় তা ও প্রিয় বিয়োগ দুঃখ।

ইপ্সিত বস্তুর অলাভ দুঃখ কি? যা পেতে ইচ্ছা করে তা পায় না, যা ভোগ করবার ইচ্ছা তা ভোগ করতে পারে না। অর্থাৎ পঞ্চ কামগুণের দ্বারা যে তৃষ্ণা উৎপত্তি হয় তা ভোগ করতে না পাওয়াই ইপ্সিত বস্তুর অলাভ জনিত দুঃখ। যেমন– চক্ষুরূপের সাথে বা আলম্বনে যে তৃষ্ণা উৎপত্তি হয় তা, ইচ্ছানুরূপ ভাবে ভোগ করতে যে বাঁধা প্রাপ্ত হয় তা ও ইপ্সিত বস্তুর অলাভ দুঃখ। অনুরূপ ভাবে কর্ণে শব্দ শ্রবণে, জিহ্বায় রস আস্বাদনে, ঘ্রাণে গন্ধ গ্রহণে, কায়ে স্পর্শ গ্রহণে যে সমস্ত তৃষ্ণা উপভোগের ইচ্ছা উৎপন্ন হয় তা অপূরণই ইপ্সিত বস্তুর অলাভ দুঃখ।

সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ দুঃখ কি? সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ নিম্নরূপ যথা– রূপ উপাদান স্কন্ধ, বেদনা উপাদান স্কন্ধ, সংজ্ঞা উপাদান স্কন্ধ, সংস্কার উপাদান স্কন্ধ ও বিজ্ঞান উপাদান স্কন্ধ।

রূপোপদান স্কন্ধে আসক্ত হয়ে সত্ত্বগণ নানা বিধ দুঃখে পতিত হয়, তদ্রূপ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান উপাদান স্কন্ধেও আসক্ত হয়ে সত্ত্বগণ নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে থাকে। এগুলোই পঞ্চ উপাদান দুঃখ। দুঃখ আর্য সত্য জ্ঞাত হওতঃ তাতে আসক্ত না হয়ে দুঃখকে পরিহার করতে হয়।

দুঃখ সমুদয় আর্য সত্য কি? দুঃখ সমুদয় অর্থ দুঃখের উৎপত্তি বা কারণ। অবিদ্যা তৃষ্ণাই দুঃখের হেতু। তা তিন প্রকার যথা– কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভব তৃষ্ণা।

কামতৃষ্ণা কি? রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এ পঞ্চ কামগুণে মুগ্ধ হয়ে তাতে সুখ ভোগ করতে যে ইচ্ছা তা কামতৃষ্ণা।

ভবতৃষ্ণা কি? এক জন্ম হতে অন্য জন্মে, এক যোনি হতে অন্য যোনিতে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করে সুখ ভোগ করার যে ইচ্ছা বা অভিলাষ তাই ভবতৃষ্ণা।

বিভব তৃষ্ণা কি? এমন কোন কোন মানুষ আছে ধর্ম-কর্ম, পাপ-পূণ্য, কুশলাকুশল, ইহকাল ও পরকার সম্বন্ধে মোটেই বিশ্বাস করে না। তারা সদা সর্বদা রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শাদি পঞ্চকাম গুণে লিপ্ত হয়ে প্রমত্ত ভাবে জীবন কাটায় বা জীবন কাটাতে যে ইচ্ছা তাকে বিভব তৃষ্ণা বলে। এক কথায় যাকে বলে উচ্ছেদবাদী।

দুঃখ নিরোধ আর্য সত্য কি? কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা এই ত্রিবিধ তৃষ্ণা নিঃশেষ, নিরোধ, বিরাগ, ত্যাগ, নিবৃত্তিই দুঃখ নিরোধ আর্য সত্য।

দুঃখ নিরোধ উপায় বা মার্গ সত্য কি? শমথ ও বিদর্শন ভাবনাই দুঃখ নিরোধের উপায়। ইহা সম্যক প্রতিপদা বা অষ্টাঙ্গিকমার্গ যথা– সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

ইহা শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা স্কন্ধ ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত।

শীল স্কন্ধ হল সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম ও সম্যক আজীব। সমাধি স্কন্ধ হল– সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। প্রজ্ঞাস্কন্ধ হল সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প।

সম্যক বাক্য কি? মিথ্যা বাক্য, পিশুন বাক্য, ভেদ বাক্য, পুরুষ বাক্য, সম্প্রলাপ বাক্য এ সমস্ত মিথ্যা বাক্য হতে বিরত থাকা সম্যক বাক্য।

সম্যক কর্ম কি? ত্রিদ্বারে সৎসুচরিত কর্ম সম্পাদন করাকে সম্যক কর্ম বুঝায়। কায়িক সুচরিত কর্ম, বাচনিক সুচরিত কর্ম ও মানসিক সুচরিত কর্ম ভেদে ইহা তিন প্রকার।

কায়দ্বারে তিন প্রকার দুষ্কর্ম-প্রাণী হত্যা, চুরি ডাকাতি ও মিথ্যাকামাচার সম্পাদন হতে বিরত থাকাই কায় সুচরিত। মিথ্যাবাক্য, পিশুনবাক্য, পরুষ বাক্য ও সম্প্রলাপ বাক্য এই চারটি বাক্য প্রয়োগ হতে বিরতি থাকাই বাক্য সুচরিত। লোভ, হিংসা ও মিথ্যাদৃষ্টি এই তিনটি মনোদুষ্কর্ম হতে বিরতি থাকা মানসিক সুচরিত। মোট দশবিধ অকুশল হতে বিরত থাকা বা সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করাই সম্যক কর্ম।

সম্যক আজীব কি? মিথ্যা জীবিকা পরিহার করে সৎ জীবিকায় জীবন যাপন করা সম্যক আজীব। অর্থাৎ প্রাণী ব্যবসা, মৎস্য ব্যবসা, বিষ ব্যবসা, মাংস ব্যবসা ও অস্ত্র ব্যবসা এ পঞ্চ নিষিদ্ধ বাণিজ্য হতে বিরত থাকা সম্যক আজীব। আবার মানকুট তুলাকুট ও কংসকুট এবং যে সমস্ত ব্যবসা করলে অকুশল বা পাপ সঞ্চয় হয় সে সমস্ত কাজ হতে বিরত থাকা সম্যক আজীব এমন কর্ম সম্পাদন দ্বারা সত্ত্বগণের কখনো হিত সুখ, মঙ্গল হয়না নিষিদ্ধ সে সব কর্ম পরিহার করাই সম্যক আজীবের লক্ষ্য।

সমাধি স্কন্ধ-সম্যক ব্যয়াম কি? ইহা চারি সম্যক প্রচেষ্টা বা প্রধান ভাবনাকারী যোগী দৃঢ় বীর্য সহকারে স্মৃতি সমপ্রজ্ঞানে অনুৎপন্ন অকুশল বা পাপ চিত্ত অনুৎপত্তির চেষ্টা উৎপত্তি অকুশল বা পাপ ক্ষয় বা ধ্বংসের চেষ্টা অনুৎপন্ন কুশল উৎপত্তির চেষ্টা আর উৎপন্ন কুশল বা পূণ্য বৃদ্ধি এবং সংরক্ষণের চেষ্টা।

সম্যক স্মৃতি কি? চারি স্মৃতি প্রস্থানই সম্যক স্মৃতি। ভাবনাকারী যোগী সবসময় যথাযথ ভাবে কায়ানুদর্শন, বেদানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন ও ধর্মানুদর্শন হয়ে অবস্থান করে। যথা– চারি ঈর্যাপথে, বাইশ প্রকার সম্প্রজ্ঞানে উৎসাহের সহিত দৃঢ় বীর্য সহকারে যথাভূত জ্ঞান দর্শন করে অবস্থান করাই সম্যক স্মৃতি।

সম্যক সমাধি কি? চিত্তের একাগ্রতা ভাবকে সমাধি বলে। সমাধির উপকরণ চারি প্রকার বীর্যে স্থিত হয়ে এক চিত্ত, এক আলম্বন করাই সমাধি। পঞ্চ নীবরন যদি ক্রমান্বয়ে লোপ হতে থাকে তখন উপাচার হতে সম্যক সমাধি হয়।

প্রজ্ঞাস্কন্ধ

সম্যক দৃষ্টি কি? এক কথায় চারি আর্য সত্য ভাবিত বর্দ্ধিত জ্ঞানকে সম্যক দৃষ্টি বলে। ইহা আবার দুই ভাগে বিভক্ত যথা– লৌকিক ও লোকত্তর। দুঃখ, দুঃখ সমুদয় সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাকে লৌকিক সম্যক দৃষ্টি বলে। আর নিরোধ এবং নিরোধে উপায় আর্যসত্য ভাবিত, বর্দ্ধিত করাকে লোকত্তর সম্যক দৃষ্টি বলে।

সম্যক সংকল্প কি? নৈষ্ক্রম্য সংকল্প, অব্যাপাদ সংকল্প ও অবিহিংসা সংকল্প। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শাদি পঞ্চ কামগুণ তৃষ্ণা বর্জন করে আগার হতে অনাগারিক ভাবে ব্রহ্মচর্য ধারণ করার যে সংকল্প তাহাকে নৈষ্ক্রম্য সংকল্প বলে।

যারা অপরের অনিষ্ট চিন্তা, অহিত চিন্তা, বিপদাকাঙ্খা না করে অমঙ্গল কামনা না করে সদা সর্বদা মৈত্রী পোষণ করে থাকে তাকে অব্যাপাদ সংকল্প বলে। অপরের প্রতি হিংসা-ক্রোধ পরায়ন না হয়ে সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, পরায়ন হয়ে সকল প্রাণী সুখী হোক দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করুক, এরূপ ভাবকে অবিহিংসা সংকল্প বলে। সুতরাং এ সকল অকুশল পাপ কর্ম থেকে বিরত থেকে স্বীয় চিত্তকে পরিশুদ্ধ করতঃ অপ্রমাদের সহিত কুশল বা পূণ্য কর্মে আত্ম নিয়োগ করাই হল বুদ্ধের প্রকৃত শান্তির অনুসন্ধান দুঃখ মুক্তির অনুসন্ধান।

বিশ্বের সকল প্রাণী সুখী হোক, দুঃখ থেকে মুক্ত হোক।

প্রয়োজনকালে সহায় (বিন্ধুতা) সুখকর, অল্পাধিক লাভে তুষ্টি ও সুখকর; জীবিত সংক্ষয়ে (জীবনান্তে) পূণ্য সুখকর আর (জীবিত কালে) সর্বদুঃখ পরিহার সুখোত্তম ॥ *–"ধম্মপদ"*

দুর্লভ মানব জীবনে প্রব্রজ্যা

শ্রীমৎ পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু
রাজ বন বিহার, রাঙ্গামাটি

মানব জন্ম লাভ দুষ্কর, সদ্ধর্ম্ম শ্রবন আয়াস সাধ্য, বুদ্ধের আবির্ভাব সহজ নহে। এই মানব জনম লাভ করিয়া জীব জগতের মধ্যে জ্ঞানে, বুদ্ধি-বিবেচনায়, প্রেমে, দয়া-দাক্ষিণ্যে সৎ ও পূণ্য কর্ম্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষই অদ্বিতীয় স্থান দখল করিয়া আছে। এই সব থাকা সত্ত্বেও অনেক মানুষ অবিদ্যা অন্ধকারে নিমর্জ্জিত থাকে। সেই জন্য মানুষ হইয়া ও নানা প্রকার দুঃখ যন্ত্রনার মধ্যে দিন যাপন করিতে হয়। এমন এক সময় ছিল যখন মানুষ অরণ্যাচারী হইয়া হিংস্র পশু পক্ষীর মত কাঁচা মাংস ভোজন করিত। বিবর্তনের মধ্য দিয়া কঠোর সাধনায় সেই মানুষ আজ ক্রমোন্নতি করিতে করিতে জ্ঞান লাভ করিয়া ও বিজ্ঞানীরা জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু সংসারের সেই চিরন্তন রীতি, সেই রীতি থেকে কাউকে তখনও পর্যন্ত রক্ষা করিতে পারে নাই।

মহামানব গৌতম বুদ্ধ রাজার পুত্র। রাজ্যের অধিকারী হইয়াও জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু হইতে মুক্ত হইবার জন্য সমস্ত রাজ্যের ধন-জন সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনে সন্ন্যাসী বা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কঠোর সাধনার দ্বারা ভব তৃষ্ণা সহ সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া আসব ক্ষয় করতঃ মুক্তির পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাই বুদ্ধ বলেন মানব জন্ম লাভ করিয়া জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, দুঃখকে অতিক্রম করিতে হইবে। কারণ দুর্লভ মানব জন্ম যদি কোন দুষ্কর্মের ফলে একবার হারাইয়া চারি অপায় প্রাপ্ত হয়, পুনঃরায় মানব জন্ম লাভ বড়ই কঠিন। তজ্জন্য মানব জন্ম লাভ করিয়া এসব দুঃখ থেকে মুক্তির তাগিদে একমাত্র লোকত্তর মার্গ বা লোকত্তর সাধনা করা প্রয়োজন। সেই লোকত্তর সাধনা করিতে হইলে সংসার ত্যাগী হইতে হইবে। সংসার জীবনে সেই সাধনা করা অত্যন্ত কঠিন। তাই সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করে প্রব্রজ্যাই নিতে হইবে, ইহা একমাত্র সহজ পন্থা। গৃহবাসে বাঁধা বিপত্তি ও ক্লেশপূর্ণ বিষাক্ত আবহাওয়া প্রকৃষ্টরূপে বর্জন করিয়া উন্মুক্ত আকাশ তুল্য বন্ধন মুক্ত পথই প্রব্রজ্যা। গৃহীজীবনে ভোগের পথ ও নানা বাঁধা বন্ধন যুক্ত বলিয়া সেখান হইতে আত্মপরহিত আকাঙ্কানুরূপ সাধন করিতে অক্ষম। সন্ন্যাস জীবন ত্যাগের পথ, যাবতীয় বাঁধা বন্ধনহীন বলে তারা আত্ম-পরহিত সাধনে সক্ষম। তদ্ধেতু সেই বিশ্ববরেণ্য মহামানবের পদাঙ্ক অনুসরণ করতঃ

সংসারাবর্ত্ত দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের জন্য কত রাজা, রাজার পুত্র, কুল পুত্র, কুল বধু, কুল কুমারী প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া মানব জন্ম সার্থক করিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ কেহ যাবজ্জীবন প্রব্রজিত হইয়া বৃহত্তম সুখের অধিকারী হইয়া থাকেন। কেহ সাময়িক প্রব্রজ্যা গ্রহণের দ্বারা কিছু দিনের জন্য প্রব্রজ্যা সুখ ভোগ করেন। বনভান্তে বলেন যাহারা গৃহী অবস্থায় মার্গ ফল লাভ করেন, তাহারা পূর্ব জন্মে কোন একসময়ে প্রব্রজিত হয়ে কঠোর ধুতাঙ্গ শীল পালন করার ফলে প্রব্রজিত না হয়ে ও মার্গফল লাভ করিতে সক্ষম হন। তাই জীবনে সপ্তাহ/পনরদিন/মাস/বৎসর কালের জন্য হইলেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া দুঃখ মুক্তির বীজ বপন করা সবার উচিত। এই প্রসঙ্গে লেখক ঈশান চন্দ্র ঘোষ জাতকে পুরাতত্ত্ব নামে পর্যালোচনা করেছেন, সেখানে প্রব্রজ্যা সম্বন্ধে এরূপ উল্লেখ করেছেন যে, সিংহল দ্বীপের বংশধর দিগের মধ্যে কেহ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে বংশ পবিত্র হয়। এই বিশ্বাসে মাতা-পিতা ও অন্যান্য অভিভাবকেরা, আপত্তি করা দুরে থাকুক, বরং কোন কোন সময়ে উৎসাহ দিয়া বালকদিগকে গৃহত্যাগে উৎসাহিত করিতেন। ভদ্রলোকদিগের মধ্যে এখন ও দেখিতে পাওয়া যায়, বংশের একটি সন্তানকে ভিক্ষু সঙ্গে প্রবেশ করাইতে পারিলে গৃহস্থ আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। যাহাদের নিজের ছেলে না থাকে, তাহারা পূণ্য লাভের আশায় অপরের ছেলেকে হইলেও প্রব্রজিত করাইয়া বুদ্ধ শাসনের উত্তরাধিকারী হইবার প্রয়াস পান।

আরো সম্রাট অশোকের জীবনীতে দেখা যায়, একবার মহারাজ ধর্মাশোক মোগ্গলি পুত্র তিস্স মহাস্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন- ভান্তে, দশবল বুদ্ধের শাসনে কে সর্বাপেক্ষা অধিক দান করিয়াছেন, কাহার দান সর্বাপেক্ষা অধিক? মহারাজ বুদ্ধ শাসনে প্রত্যয় দায়কদের মধ্যে আপনিই সর্ব প্রধান। আপনি যত দান করিয়াছেন আর কেহ এত দান করেন নাই। সুতরাং আপনিই প্রত্যয় দায়কগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই কথা শুনিয়া মহারাজ ধর্মাশোক বলিলেন, আমি প্রত্যয় দানে বুদ্ধ শাসন সজীব করিয়াছি। সুতরাং আমার দানই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এইরূপ হইলেও আমি বুদ্ধ শাসনের দায়াদ বা উত্তরাধিকারী হইলাম কিনা? অর্থাৎ আমি পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া যেমন সসাগরা জম্বুদ্বীপের উপর আধিপত্য ও পুখৈশ্বষ্য ভোগ করিতেছি সেইরূপ বুদ্ধ শাসনে বা ভগবানের ধর্মরাজ্যের উত্তরাধিকারী হওয়ার আমি উপযুক্ত হইয়াছি কিনা? মোগ্গলি পুত্র তিস্স মহাস্থবির বলিলেন মহারাজ আপনি প্রত্যয় দায়ক মাত্র। যদি পৃথিবী হইতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ও উচ্চ রাশিকৃত দানীয় বস্তু সজ্জিত করিয়া মহাদান দেওয়া হয় তথাপি, সে প্রত্যয় দায়ক মাত্র। তবে যে কোন ধনী অথবা দরিদ্র ব্যক্তি স্বীয় ঔরসজাত পুত্রকে বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজ্যা প্রদান করেন, উপসম্পদা দেন, তিনিই বুদ্ধ শাসনের প্রকৃত অধিকারী। মহাস্থবিরের এইকথা শুনিয়া মহারাজ ধর্মাশোক নিজের পুত্র ও কন্যাকে বুদ্ধ শাসনে দান করিলেন এবং নিজে বুদ্ধ শাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন। তাই বলা হইয়াছে জম্বুদ্বীপ প্রমাণ বিহার নির্মাণ করিয়া তাতে যে ভিক্ষু সংঘ বিহার করবেন, তাদের পরিচর্যার জন্য তিন দ্বীপ (পূর্ববিদেহ, অপর গোয়ান, উত্তর কুরু) শষ্যাদি বপন করিয়া সিনেরু প্রমাণ প্রয়োজনীয় বস্তুদান করিলে যেই পূণ্য হইবে তাহা পুত্রকে প্রব্রজ্যা দান বা নিজ প্রব্রজ্যার পূণ্যের তুলনায় ষোল ভাগের একভাগ ও হয়না। বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু এই প্রথার সম্পূর্ণ বিপরীতে দেখা যায়। এখানে নিজের ছেলেকে বুদ্ধ শাসনে দান করা দূরে থাক, বরং অপরের পুত্র বা নিকট আত্মীয়কে

প্রব্রজিত হইতে দেখিলে ও নানা ধরণের বাঁধা সৃষ্টি করিতে দেখা যায়। আর বুদ্ধ বলিয়াছেন কোন পূণ্য কার্য্য নিজে করিবে এবং অপরকে ও উৎসাহিত করিবে। যদি নিজে পূণ্য কায্য করিতে না পারেন তাহা হইলে অপরকে পূণ্য কার্য্য করিতে উৎসাহ দিবে এবং পূণ্য কার্য্য করিতে দেখিলে সাধুবাদের সহিত অনুমোদন বা প্রশংসা করিবে। এরূপ করিলেও দানকারীর সঙ্গে পূণ্যের অংশ গ্রহণ করা হয় এবং তাতে পূণ্যের ভাগী হবেন। সেই জন্য যে কোন পূণ্য কার্য্যে বাঁধা সৃষ্টি না করিয়া অধিকন্তু সবাইকে উৎসাহিত করা উচিত।

প্রব্রজ্যা গ্রহণে পূণ্য হয় বলিয়া লোকে উৎকট ব্যধিগ্রস্থ হইলে সময়ে মানস করিতে যে আমি আরোগ্য লাভ করিলে প্রব্রজীত হইব। সেইরূপ বুদ্ধ জীবিত থাকা কালীন একবার শ্রাবস্তী বাসীর এক ব্যক্তি নাকি পান্ডুরোগে এরূপ কাতর হইয়াছিলেন যে, বৈদ্যরা তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী-পুত্রগণ ও নিতান্ত হতাশ হইয়া ভাবিতেন আহা! এমন কোন লোক কি ভাগ্য বলে পাওয়া যাইবে, যিনি ইহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিবেন? শেষে ঐ ব্যক্তি কামনা করিলেন "আমি যদি আরোগ্য লাভ করিতে পারি তাহা হইলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব"। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহার কয়েক দিন পরেই কোন উপকারক দ্রব্য লাভ না করিয়া সেই ব্যক্তি নীরোগ হইলেন এবং জেতবনে গিয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। তিনি শাস্তার নিকট প্রথমে প্রব্রজ্যা পরে উপসম্পদা প্রাপ্ত হইলেন এবং অচিরে অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব অবস্থায় এই ভাবে মানস করে রোগ থেকে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন বলে জাতকে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহলে প্রমাণিত হয় যে, যতদিনের জন্য প্রব্রজিত হউক না কেন বা প্রব্রজ্যা ধর্ম পালন করুক না কেন তার সুফল কখনো বৃথা যায় না।

যদি বিজ্ঞান, কোন বৃত্তি, মেধাবী, প্রজ্ঞাবান, শীল সম্পন্ন ও সমাধি পরায়ন ব্যক্তিকে দিনের পর দিন বিচার করিয়া প্রশংসা করেন, তবে জম্বুনদ (স্বর্ন) নির্মিত নিষ্ক (কণ্ঠাভরন) যেমন কেহ নিন্দা করেনা, তেমন তাহাকে ও কে নিন্দা করিতে সক্ষম? দেবতাগন ও তাঁহাকে প্রশংসা করেন। ব্রহ্মা কর্তৃক ও তিনি প্রশংসিত।

–"ধম্মপদ"

বৌদ্ধ ধর্ম কি এবং কেন?

শ্রীমৎ ব্রহ্মদত্ত ভিক্ষু
রাজ বন বিহার, রাঙ্গামাটি।

বুদ্ধ অর্থ জ্ঞান। ধর্ম অর্থ অন্ধ বিশ্বাস নয়, প্রমাণহীন নিশ্চাত্মক ধর্মমত ব্যাখ্যা করে না এবং কোন কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচার ও পূজা পার্বনের জন্য উৎসাহিত করে না। অধিকন্তু সর্ব ক্লেশ হতে বিমুক্তি এবং সর্বোচ্চ প্রজ্ঞা লাভের জন্য পবিত্র চিন্তায় ও বিশুদ্ধ জীবন-যাপনে ধর্ম জ্ঞান না থাকলে বৌদ্ধ ধর্ম জানতে ও বুঝতে পারা যায় না। বৌদ্ধ ধর্ম গম্ভীর, সুউচ্চ, সাধারণের বোধগম্য নয়। এজন্য মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধ ছয় বৎসর কঠোর সাধনা করে যখন বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন তখন দেখতে পেলেন এ জগতের লোকেরা পঞ্চকামগুণ নিয়ে লোভ লালসায় মোহিত। তাদের এ অজ্ঞান ও মুর্খতা দরুন ভগবান বুদ্ধের কথা বুঝতে পারে না। তিনি সংকল্প করলেন তার দুর্লভ স্বধর্ম রত্ন প্রকাশ করবেন না। কিন্তু মহাব্রহ্মা ভগবান বুদ্ধের মনস্থ বুঝতে পেরে ভগবান বুদ্ধের এক প্রান্তে উপবেশন করে হাতজোড় পূর্বক প্রার্থনা করলেন "ভগবান জগতের লোকদের যত অজ্ঞান ও মুর্খ দেখছেন তত অজ্ঞান ও মুর্খ নয়, জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তি ও আছেন। প্রাণীগণ জন্মজন্মান্তরে ভগবান বুদ্ধ মহাব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় ধর্ম প্রচার কার্য সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের লোকসংখ্যা প্রায় তের কোটি। তন্মধ্যে প্রায় বার লাখের মত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। চাকমা, মারমা, বড়ুয়া এ তিন সম্প্রদায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা যদিও বৌদ্ধ বলে পরিচয় দেয় প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম কি তা সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারছেনা। পরিণামে অবিদ্যা ও মিথ্যা দৃষ্টির জ্বালে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে।

বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায় সুখ ভোগ করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ক্লিলটন কেন নারী কেলেঙ্কারী মামলার সাথে জড়িত হয়েছেন? বিশ্ব বিখ্যাত নামী-দামী খেলোয়াড় পেলে, ম্যারাডোনা, ইমরান খান, পঞ্চকামগুণে আসক্ত হয়ে তাদের যশ কীর্তি হারাতে বসেছে। বিখ্যাত মনীষি, কবি লেখকের বই পড়েও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হিংসা হানা-হানি ও যুদ্ধ কেন? কেন বিজ্ঞানের তৈরী বোমা অস্ত্র দ্বারা হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়?

ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এ বিশ্বের কোন মনীষি, লেখক, কবি, বৈজ্ঞানিক, শান্তি, সুখ ও কল্যাণ বয়ে এনে দিতে পারে না। অমৃতময় বৌদ্ধ ধর্মের মূলতত্ত্ব চারি আর্য্যসত্যকে আয়ত্ব করতে পারলে পৃথিবীর কোন শক্তিতে আর মন বিচলিত ও মোহিত হবে না। বুদ্ধের এমনই শক্তি বা গুণ নিহিত আছে, যা পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। দেবতা ব্রহ্মা, মার, যক্ষ ও নাগ কেউ বুদ্ধকে পরাজিত করতে পারেনি। যদিও মার, যক্ষ ও নাগেরা মুহুর্তের মধ্যে এ পৃথিবীকে ধ্বংস করতে পারে। এ প্রসংগে বুদ্ধের কিছু গুণ বা শক্তির কথা উত্থাপন করা প্রয়োজন।

১. এক সময় বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র খোলা আকাশের নীচে ধ্যান ভাবনা করার সময় নন্দ নামক এক শক্তিশালী যক্ষ তার মাথায় আঘাত করল। কিন্তু সারিপুত্র ধ্যান মগ্নাবস্থায় ছিলেন বলে সেই প্রবল আঘাত তাঁকে বিচলিত বা ক্ষত করতে পারে নি। অথচ যক্ষের এমন শক্তি ছিল যে, সেটা সারিপুত্র না হয়ে যদি কোন পর্ব্বতে লাগত তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পর্ব্বতের চিহ্ন পর্যন্ত থাকত না। বুদ্ধের কি অদ্ভুত গুণ?

২. একদা ভগবান পাঁচশত শিষ্যসহ তাবতিংস স্বর্গে যাবার সময় নন্দোপনন্দ নাগ রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে ঋদ্ধি বলে সুমেরু পর্ব্বতের ফণা দ্বারা অন্ধকার করেছিলেন। তখন বুদ্ধের দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক মহামোদ্ গলায়নকে বুদ্ধ অনুমতি দিলেন নন্দোপনন্দ নামক ঋদ্ধিমান নাগরাজকে ঋদ্ধি বলে দমন করতে। এরপর মোদ্গলায়নের সাথে নাগ রাজার যুদ্ধ হয়। নাগরাজা তার স্বীয় শক্তি প্রয়োগ করে ধুম্র, আগুন, বিষ নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

অন্যদিকে বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক মোদগলায়ন চারি প্রকার ঋদ্ধি পাদগুণে নাগরাজার বিষাক্ত ধুম্র আগুন ও বিষ নিঃশ্বাসে তাঁর (মোদগলায়ন) একটি লোমকেও বিচলিত করতে পারলেন না। নাগ রাজার এমনই শক্তি যা ক্ষণিকের মধ্যে ধুম্র, আগুন, বিষ নিঃশ্বাসের দ্বারা পৃথিবীকে ধ্বংস করতে পারে। বুদ্ধের এমনই শক্তি নাগ রাজার শক্তিকে বিনষ্ট করে তাঁকে পরাজিত করতে পারে।

৩. একবার বুদ্ধের সময়ে সারিপুত্রের সতের জন শিষ্য অরণ্যে গমন করলেন। অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র তার প্রজ্ঞাশক্তি দ্বারা জানতে পারলেন যে, তাঁর শিষ্যরা বনে গেলে বিপদ হবে এমনকি প্রাণ নাশও হতে পারে। তাই সারিপুত্র তার অর্হৎ শিষ্য সাংকীষ্য শ্রমনকে সেই সতের জনের সঙ্গে পাঠালেন। বনে গিয়ে তাঁরা ভাবনায় মগ্ন হলেন। তাঁদের সঙ্গে এক সুঠাম দেহী সেবক ছিল। একদিন একদল ডাকাত ঐ সেবককে পেয়ে বলি দেয়ার জন্য নিয়ে যায়। সেবক বলল, "আমাকে বলি দিও না। বনে আরো সতের জন ভিক্ষু আছেন।" তারপর পাঁচশত ডাকাত খুশী হয়ে ভিক্ষুদেরকে নিয়ে গেল। ডাকাতরা ভাবল প্রথমে ছোট শ্রবনকে বলি দিই। তাই তারা বলি দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলে অর্হৎ শ্রমণটি চতুর্থ ধ্যানে মগ্ন হলেন। ডাকাতরা তাঁকে ধারালো তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতে চেষ্টা করলে তলোয়ারটি খান খান হয়ে ভেঙ্গে যায়। তার পর পেটে ছুরিকা ঢুকাতে চেয়ে তা বেঁকে যায়। শ্রমনের কি অদ্ভুত শক্তি? পরে তারা শ্রমনের শক্তি বুঝতে পেরে তাঁর কাছে প্রব্রজ্যা নিয়ে অর্হৎ হলেন। ইহাতে বুঝা যায় বুদ্ধের অতুলনীয় গুণ যা ডাকাতদেরকে ডাকাতি পেশা ছেড়ে অর্হৎ ভিক্ষুতে উন্নীত করেছিল।

বৌদ্ধ ধর্মের মূলতত্ত্ব জানতে ও বুঝতে হলে চারি আর্য সত্য জ্ঞান, প্রতীত্য সমুৎপাদনীতি জ্ঞান ও আসবক্ষয় জ্ঞান আয়ত্ব করতে হবে। তা অর্জনের জন্য চারটি বিষয় হচ্ছে–

ক. সৎ পুরুষের সহচর্যঃ অর্হৎ ভিক্ষুর সান্নিধ্যে থেকে তাঁর উপদেশমত স্বীয় জীবন পরিচালিত করা।

খ. **স্বধর্ম শ্রবনঃ** সত্য ধর্ম (অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ) শ্রবন করা।

গ. **জ্ঞান যোগে চিন্তাঃ** জ্ঞান (চারিআর্য সত্য) নিয়ে চিন্তা করা।

ঘ. **সত্য ধর্ম অনুশীলনঃ** চারি আর্য সত্য অনুশীলন করা।

এ চারিটির মধ্যে ১নং অর্থাৎ সৎ পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারলে বাকী তিনটি অঙ্গও পূরণ করতে পারা যায়। বুদ্ধ বলেছেন- "জ্ঞান না থাকলে অর্হৎকে দেখলেও চিনতে পারা যাবে না।"

আমাদের সৎপুরুষও খুব বেশী দূরে নয়, যার জন্মে এ পার্বত্য মাটি হয়েছে পবিত্র। যিনি দীর্ঘকাল সাধনা (গবেষণা) করে মুক্ত হয়ে অপরকে মুক্তির পথ নির্দেশ করে যাচ্ছেন- সেই কল্যাণ মিত্র পরম পূজনীয় আর্য পুরুষ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভান্তে) বর্তমানে রাঙ্গামাটি রাজ বন বিহারে অবস্থান করছেন। তিনিই একমাত্র মহাপুরুষ যাঁকে দর্শনে চারটি অঙ্গ অতি সহজে ও অনায়াসে পরিপূর্ণ হয়। তাঁর দেশনা শুনে বৌদ্ধ ধর্মের মর্মার্থ কি এবং তা আচরণে কি সুখ তা গভীর ভাবে উপলদ্ধি করতে পারা যায়। তিনি বলেন– "বৌদ্ধ ধর্মের সুখ লাভ করতে হলে (১) নির্বানের ট্রেনিং, (২) নির্বানের শিক্ষা, (৩) নির্বানের জ্ঞান ও (৪) নির্বানের উপদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানতে হবে।"

এগুলো সম্পর্কে সম্যক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করে শীল সার, সমাধি সার, প্রজ্ঞা সার, বিমুক্তি সার, বিমুক্তি দর্শন সার, পরমার্থ বা নির্বান সার চিনতে ও জানতে পারলে অতি সহজে নির্বান লাভ করা যায়।

পরিশেষে আবারো বলতে হয় বৌদ্ধ ধর্ম উত্তম ধর্ম, শ্রেষ্ঠ ধর্ম, উচ্চ ধর্ম, নির্মল ধর্ম, স্বাধীন ধর্ম, সুখ ধর্ম.....। এসো সবাই এ ধর্মের আস্বাদ উপভোগ করে নির্বান সাক্ষাৎ করি।

#

শেষ ভাল যার সব ভাল তার

ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া

বাংলায় একটা প্রবাদ বাক্য আছে- 'শেষ ভাল যার সব ভাল তার'। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একজন লোক সারাজীবন ধরে হাজার হাজার কর্ম সম্পাদন করে থাকে। প্রত্যেক কর্মের অন্তরালে জন্ম বীজ নিহিত থাকে। তবে প্রত্যেক জন্মবীজ গজায় না, জনক কর্মই ফল দেয়। সে কর্ম তার মৃত্যুকালে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় উপস্থিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম মতে তাকে নিমিত্ত বলে। এ নিমিত্ত পাঁচ প্রকার, যথা- মনুষ্য নিমিত্ত, দেব নিমিত্ত, তির্যক নিমিত্ত, নরক নিমিত্ত ও প্রেত নিমিত্ত। মৃত্যুকালে যে মাতা-পিতা তথা মনুষ্য নিমিত্ত দর্শন করে সে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে। যে সুন্দর সুন্দর রথ, বাড়ী ও ফুলের বাগানের নিমিত্ত দর্শন করে সে স্বর্গে দেবকুলে জন্মায়। যে নীরব ভাবে পড়ে থাকে বন পশুপাখি ছাড়া কিছু দেখতে পায় না; অজ্ঞান অবস্থায় থাকে সে তির্যক (পশুপাখি) কুলে জন্মগ্রহণ করে থাকে। যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য, আগুন ইত্যাদির নিমিত্ত দর্শন করে সে নরকে পতিত হয়। আর যে মৃত্যুকালে অন্ধকার কিংবা নর কংকালের নিমিত্ত দর্শন করে সে প্রেতকুলে জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি মৃত্যুর পর দেবকুলে বা মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করতে পারে তার জীবনই সার্থক বলে অভিহিত করা যায়। কারণ তার নিম্নগতি হয় নাই; অধিকন্তু দেবকুলে বা মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করা মহা কঠিন ব্যাপারও। যার কর্মবীজ ভাল অর্থাৎ সৎকর্ম, সৎবাক্য ও সৎজীবিকা করে মৃত্যুকালে ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন থাকেন, জ্ঞানহীন হন ও দান, শীল, ভাবনার কথা স্মরণ করে সদগতি প্রাপ্ত হন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা সারা জীবনে যে সৎকর্ম করে তদ্বারা ইহজন্মে সুফল ভোগ করে আর পরবর্তী জন্মেও মনুষ্যলোকে বা দেবলোকে জন্ম নিয়ে বিপুল সুখের অধিকারী হয়। এখানে শেষ ভাল যার সব ভাল তার'-এর অর্থ মৃত্যুকালে সুনিমিত্ত দর্শন (তা অবশ্য সৎকর্ম সম্পাদনের ফলে) করা।

সাধারণভাবে আরো একটা উদাহরণ দেয়া যায়। যেমন ধরা যাক ফুটবল খেলার কথা। একদলের খেলোয়াড়রা খেলার প্রায়টুকু শুধু নিজেদের রক্ষণভাগ সামাল দিয়ে শেষ হবার মুহূর্তে প্রতিপক্ষের জালে গোল করে জয়ী হয়ে ট্রপি জয় করল। ঠিক তেমনি, মনুষ্য জীবনে মৃত্যুকালে সুনিমিত্তই প্রধান।

এতক্ষণ আলোচ্য বিষয়ের জন্য উপমায় (সংক্ষিপ্তভাবে) আলোচনা করছি মাত্র। এবার মূল আলোচনায় (আসা যাক) আসি-শ্রদ্ধেয় বনভান্তে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারে তাঁর অভিজ্ঞতাপূর্ণ ধর্মদেশনা প্রদান করে থাকেন। আমরা উপাসক-উপাসিকারা আমাদের জ্ঞানের তারতম্য অনুযায়ী তা ধারণ করি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁর ধর্মদেশনার শেষ মুহূর্তে সম্পূর্ণ দেশনার অর্থ প্রকাশ পায়। ধর্মদেশনার আগে, মধ্যে ও শেষে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করলে তা বুঝা যায়। বহু উপমামূলক ধর্মদেশনার মধ্যেও তার প্রমাণ পেতে কষ্ট হয় না। তবে তুলনামুলক ভাবে খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই সম্পূর্ণ দেশনার মর্মার্থ বুঝতে সক্ষম হন। তাই কেউ কেউ তাঁর দেশনা হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম হয়ে সমালোচনা তথা বিভিন্ন মন্তব্য করে বা করতে দেখা যায়। আমার মতে তাদের অজ্ঞতা তথা জ্ঞানের পরিধি কম হবার কারণে সে সমস্যার সৃষ্টি হয় মাত্র। অন্যথায় সমস্যা সৃষ্টি হবার কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। সেরূপ ভুল সংশোধনের জন্যেই শ্রদ্ধেয় বনভান্তের মুখ নিঃসৃত (ঐরূপ) দেশনা হতে মাত্র তিনটি প্রকাশ করছি–

১। একদিন রাজবন বিহারের দেশনালয়ে অনেক উপাসক-উপাসিকা উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধেয় বনভান্তে জনৈকা উপাসিকাকে লক্ষ্য করে বললেন– "তোমার শ্বশুরকে দেখেছ?" উপাসিকা বললেন– হ্যাঁ ভান্তে দেখেছি। বনভান্তে বললেন তোমার শ্বশুর খুব রসিক প্রকৃতির লোক ছিল। বৃদ্ধা উপাসিকা একটু হেসে মুখ নীচু করে বসে আছে। অতঃপর তিনি বললেন আমি যখন গৃহী অবস্থায় ছিলাম তখন তোমার শ্বশুর আমার সঙ্গে খুব রসিকতা করতো। আমি তাকে এড়িয়ে চলতাম প্রায়সময়। রসিকতা আমার পছন্দ হতো না। আমার বয়স যখন ২৪ বৎসর, তখন একদিন আমি নদীতে একখানা খালি নৌকা বেয়ে নীচের দিকে যাচ্ছি। নদীর ধারে তোমার শ্বশুর দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে বলল– রথীন্দ্র, এদিকে এসো। আমি তাকে দেখেও না দেখার ভান করে নৌকা বেয়ে চলছি। আবার বলল– আরে ভাই, তুমি সাধু পুরুষ, তোমার পূণ্য হবে। দয়া করে আমাকে একটু নদীর অপর পাড়ে পার করিয়ে দাও। আমি চিন্তা করলাম বৃদ্ধ লোকটি খুব রসিক হলেও আপাততঃ বিপদে পড়েছে তাকে নদীপার করিয়ে দিলে ভাল হয়। অধিকন্তু পূণ্যের কথাও বলতেছে। এমনি করে তাঁকে নৌকায় তুলে নিই। নৌকার মাথায় বসা মাত্রই সে বলল- আমাকে উপরের বাঁকে নিয়ে যাও। আমি বললাম– আপনি এইমাত্র বললেন নদী পার করে দিতে, আর এখন (পরমুহূর্তে) বলছেন উপরের (স্রোতের প্রতিকূলে) বাঁকে নিয়ে যাওয়ার কথা। আপনার কথার সহিত কাজের কোন মিল নেই। তিনি হেসে বললেন– আগে যদি একথা বলতাম তুমি কোনদিন আমাকে নৌকায় তুলে নিতে না। আমার অনিচ্ছা স্বত্তেও নদীর উজানে বেয়ে চললাম। ঠিক কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা গেল নদীর ধারে এক রমনী পাকা মরিচ তুলছে। তখন আমাকে বলল– দেখ, দেখ, দেখ কি সুন্দর রমনী! সে সময় আমার খুব লজ্জা লাগছে। তোমার শ্বশুর আমাকে সে রমনী কে দেখার জন্যে বারবার তাগিদ দিচ্ছে। বারবার চোখের ইশারা ও ভঙ্গিমায় দেখার জন্যে উৎসাহিত করছে। কিন্তু আমি সেদিকে চোখ দিই না। একটু পরে তার দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম তার চোখ দুটি সুন্দরী রমনীর দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে আছে। তখন শ্রদ্ধেয় বনভান্তে আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন- সে ব্যক্তি কিভাবে চেয়ে আছে জান? শিয়াল মহিষকে যেভাবে চেয়ে থাকে সেভাবে চেয়ে আছে। আবার তিনি আমাকে বললেন- আচ্ছা, বলতো শিয়াল মহিষ ধরতে পারে কিনা? আমি হেসে হেসে বললাম– না ভান্তে। তিনি বললেন– ধরতে না পারলে এভাবে চেয়ে থাকে কেন? একথাগুলি বলার সাথে সাথে সকলের মুখে হাসির শব্দ শোনা যায়। একটু পরে হাসির শব্দ থেমে যাওয়ার পর তিনি গম্ভীর ভাবে বললেন– এ গুলি হল আসক্তি। মানুষ প্রথমে মানসিক পাপ করে। দ্বিতীয় বারে কথায় পাপ করে, তারপর (তৃতীয় বারে) কায়ে পাপ করে। আসক্তিই পাপের মুল কারণ। আসক্তি মনকে কলুষিত করে। এ দেশনার 'শেষ ভাল যার সব ভাল তার' মূলমন্ত্র হচ্ছে "আসক্তিই পাপের মূল কারণ"।

২। সপ্তাহের অন্যান্য দিনের তুলনায় শুক্রবার দিন রাজ বন বিহারে সদ্ধর্ম্ম প্রাণ উপাসক-উপাসিকারা অধিক সংখ্যক উপস্থিত থাকেন। কোন এক শুক্রবার সকালবেলা সংঘদান ও অষ্ট পরিস্কার দান অনুষ্ঠিত হয়। দান শেষে শ্রদ্ধেয় বনভান্তের ধর্মদেশনা দেয়ার পর্ব। তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্মদেশনা দিচ্ছিলেন। দেশনা প্রসঙ্গে ব্রিটিশ আমল, পাকিস্থান আমল ও বাংলাদেশ আমলের শাসক, শাসন ও পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন– ব্রিটিশরা কিভাবে এ দেশ শাসন করেছে জান? পাঠানকে পাঠান দ্বারা, পান্‌জাবীকে পান্‌জাবী দ্বারা, বিহারীকে বিহারী দ্বারা, হিন্দুদেরকে হিন্দু দ্বারা, বাংগালীদেরকে বাংগালী দ্বারা, চাকমাদেরকে চাকমা দ্বারা, কুকিদেরকে কুকি দ্বারা দেশ শাসন করেছে। যেমন হাতীকে হাতী দ্বারা যেভাবে বাঁধে। তাদের অগাধ জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিভিন্ন কৌশল ছিল। জ্ঞান, বুদ্ধি ও কৌশল অবলম্বন করতে না পারলে প্রায় দুশত বৎসর এদেশে রাজত্ব করতে পারত না। স্বাধীনতা আন্দোলনের ভূমিকায় মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল নেহেরু, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ প্রভৃতি বড় বড় নেতা ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে অহিংসা নীতি ছিল। বাংগালীদের মধ্যে সূর্যসেন ও ক্ষুদিরাম অন্যতম নেতা ছিলেন। ..... শ্রদ্ধেয় বনভান্তে ছোটবেলায় যে ক্ষুদিরামের গান ও সুর্যসেনের নামে যে কবিতা রচিত হয়েছিল তা অনর্গল মুখস্থ আবৃত্তি করেন। সূর্যসেনের কবিতা বলতে অনেকক্ষণ সময় লেগেছে। তিনি বলেন- সূর্যসেনের মৃত্যুদন্ডের সময় মৃদু ভূ-কম্পন হয়েছিল। অতঃপর তিনি

পাকিস্থান আমল ও বাংলাদেশ আমলের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। তিনি বলেন– আমি লোকের মুখে শুনেছি ব্রিটিশ আমলের আইন প্রণয়ন করলে দেশের লোক সুখে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। এটা কি ঠিক? শ্রদ্ধেয় বনভান্তে আমারা প্রতি লক্ষ্য করে বলেন– তোমার এখন অনেক বয়স হয়েছে? তুমি কি আগের মত যুবক হতে পারবে? আমি বললাম– ভান্তে, কখনো না? তিনি বললেন- ভগবান বুদ্ধ কি বলেছেন জান? বর্তমান অবস্থায় জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিত্তে থাকাই উত্তম। তিনি কবিতার ছন্দে বলেন-

অতীতের যা কিছু ফেলে দাও অতীতে।

কদাপি না দিও তারে পুনঃ আবির্ভাব হতে।।

এ দেশনার 'শেষ ভাল যার সব ভাল তার' সংক্ষিপ্ত সারমর্ম হল "বর্তমান অবস্থায় জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিত্তে থাকাই উত্তম"।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করছি যে, শ্রদ্ধেয় বনভান্তের দেশনা শেষে জনৈক ভদ্রলোক সমালোচনাস্বরে বললেন– "আজকাল শ্রদ্ধেয় বনভান্তে রাজনৈতিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে দেশনা করেন"। আমি বললাম, আপনি বোধ হয় ভালভাবে বুঝেননি। অনেক লোকের মন্তব্য হল ব্রিটিশ আমলের আইন ভাল ছিল। কেউ বলে থাকে পাকিস্তান আমলের আইন ভাল ছিল। আর কেউ বলে থাকে, পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বায়ত্তশাসন পেলে মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। ঐসব মন্তব্যগুলির উপর ভিত্তি করে শ্রদ্ধেয় বনভান্তে বলেন– এ গ্লানি কোনটাই সঠিক নয় বৌদ্ধ ধর্ম মতে। বর্তমান অবস্থাকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিত্তে থাকার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। উক্ত ভদ্রলোক এবার দেশনার অগ্র, মধ্য ও শেষের অর্থ বুঝতে পেরে বললেন, এতক্ষণে আমি শ্রদ্ধেয় বনভান্তের দেশনা ভালভাবে বুঝতে পেরেছি।

একদিন রাজ বন বিহারের দেশনালয় উপাসক-উপাসিকা দ্বারা ভরপুর। শ্রদ্ধেয় বনভান্তে তাদের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা দিচ্ছিলেন। উপাসকক-উপাসিকাদের মুখে হাসির কলরব পরিলক্ষিত হয়। এক পর্যায়ে শ্রদ্ধেয় বনভান্তে আমার প্রতি লক্ষ্য করে বলেন– তুমি যদি ভিক্ষু হও তোমার স্ত্রী ভুলক্রমে তোমার চা কাপে চিনি না দেয়, তাকে লাঠি দিয়ে মারবে নাকি? আমি বললাম– ভান্তে, আমি যদি ভিক্ষু হই আপনার বিহারে হব। এখানে সেরকম পরিস্থিতির সুযোগ নেই। অতঃপর তিনি জনৈক ভিক্ষুর হীন কর্মকান্ডের কথা বার বার বলতে থাকেন। এদিকে উপাসক-উপাসিকাদের মধ্যে হাসির কলরব পড়ে যায়। আর এক পর্যায়ে তিনি বিহারের উঠানে ঘুঘু দেখিয়ে দিয়ে বলেন– এ ঘুঘুটি যদি মানুষের আশেপাশে ঘুরাফেরা করে তবে হঠাৎ কেউ ধরে ফেলবে। ঠিক সেরকম যুবতী নারীও যুবক (নবীন) ভিক্ষুদের সাথে বেশী মেলামেশা করা উচিত নয়। জনৈক ভিক্ষু জনৈকা যুবতীকে চুরি করে নিয়ে গেছে। এ কথা বলার পর হাসির সোরগোল পড়ে যায়। এভাবে কয়েকজন ভিক্ষুর হীন কার্যকলাপ সম্বন্ধে ব্যক্ত করেন। তাতে উপাসক-উপাসিকারা শুধু হাসতে থাকে। অবশেষে শ্রদ্ধেয় বনভান্তে বলেন– উইপোকা আর ইদুঁর কাহারো অপকার ছাড়া উপকার করেনা। ঠিক তেমনি যারা হীন তারা নিজের ক্ষতি করে ও ধর্মের মহা ক্ষতি সাধন করে থাকে। এখানে 'শেষ ভাল যার সব ভাল তার' হল– "হীন ব্যক্তিরা নিজের ও ধর্মের মহা ক্ষতিসাধন করে"।

উল্লেখ্য যে ধর্মদেশনা শেষে জনৈকা মহিলা চাকমা ভাষায় বলল– 'এচ্ছা বনভান্তে বানা নাগর মাট্টে দে'। এ কথার অর্থ হল আজ বনভান্তে শুধু বাজে আলাপ (রসিকতা) করেছেন। তাহলে এখানে প্রমাণ হল শেষ ভাল যার সব ভাল তার স্বরূপ 'হীন ব্যক্তিরা নিজের ও ধর্মের মহা ক্ষতিসাধন করে' এ দেশনাটুকুর অর্থ তিনি বুঝতে পারেননি।

দীর্ঘদিন প্রবাসী দুরদেশ হইতে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিলে জ্ঞাতি মিত্র ও সহৃদবর্গ যেমন তাঁহার আগমন অভিনন্দন করে, তদ্রুপ পূণ্যবান ও ইহলোক হইতে পরলোক গমন করিলে তাঁহার পূণ্য সমূহ আগত প্রিয় জ্ঞাতির ন্যায় তাঁহাকে সাদরে গ্রহন করে। *–"ধম্মপদ"*

কর্ম ও কর্মফল

শ্রীমৎ করুনা বর্দ্ধন ভিক্ষু
নানিয়ার চর রত্নাংকুর বন বিহার।

বৌদ্ধ ধর্মের মূল ভিত্তি কর্মফল। মানুষ কর্ম অনুসারে ফল ভোগ করে। ভাল কাজ করলে ভাল ফল এবং খারাপ কাজ করলে খারাপ ফল পাওয়া যায়। পৃথিবীতে সকল মানুষ আবার সমান নয়। কেউ অল্পায়ু, কেউ দীর্ঘায়ু, কেউ সবল, কেউ দূর্বল, কেউ ধনী, কেউ গরীব, কেউ মূর্খ, কেউ পণ্ডিত ইত্যাদি। বুদ্ধ বলেছেন সৎ কর্মদ্বারা দীর্ঘায়ু এবং অসৎ কর্ম দ্বারা অল্পায়ু হয়। এভাবে মানুষ রোগী বা নিরোগী, সুশ্রী বা বিশ্রী, ধনী বা গরীব, সুখী বা দুঃখী হয়। এ জন্য মানুষ কর্মের অধীন। শুধু মানুষ নয়, জীব জগতই কর্মের অধীন। কর্মই জীবনের বন্ধু, কর্মই জীবনের আশ্রয়। কর্মদ্বারা উন্নত জীবন বা নীচু জীবন লাভ হয়। বুদ্ধের ব্যাখ্যাত কর্ম ও অন্যান্য ধর্মের কর্ম থেকে ভিন্ন রকমের। "আমি তোমাদেরকে মুক্ত করব" বুদ্ধ এ কথা বলেননি। জন্ম থেকে পরিত্রাণই হচ্ছে মুক্তি। কিন্তু জন্মের বন্ধন ছিন্ন করার মূলে কর্মই প্রধান। সে জন্য বুদ্ধ সৎকর্ম সম্পাদন পূর্বক জন্ম বন্ধন ছিন্ন করার পথ নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন। সৎ কর্ম সম্পাদন ছাড়া একজন ভিক্ষুরও নির্বাণ সাক্ষাৎ অসম্ভব। শ্রদ্ধেয় বনভান্তে বলেন– "পূর্বজন্মের পারমী, সৎ গুরুর উপদেশ ও নিজের প্রচেষ্টা ব্যতিত নির্বাণ সাক্ষাৎ অসম্ভব।" এখানে নিজের প্রচেষ্টা বলতে সৎ কর্মকে বুঝানো হয়েছে। তাই লোকের জ্ঞান লাভের জন্য সাধনা ও সৎকর্মের প্রয়োজন। পৃথিবীর সকল জীব নানা কর্ম সম্পাদন করে নানা ফল ভোগ করছে। প্রাণীজগৎ এই কর্মের নিয়মেই চলছে। ছোট-বড়, রাজা-প্রজা, শিক্ষক-চিকিৎসক সবই লাভ হয় কর্মানুসারে। বুদ্ধ বলেছেন- "অন্তরের চেতনাই কর্ম।" মানুষের মন যখন লোভ ও মোহের কথা ভাবে তখন তার মধ্যে কামনা ও বাসনা উৎপন্ন হয়। মনের এই কামনা বাসনা অদৃষ্ট। এই অদৃষ্ট কর্মই দিয়ে থাকে বৃহৎ ফল। সব সময় কুশল কর্মের কথা ভাবলে অকুশল কর্মের হেতু উৎপন্ন হওয়ার কথা নয়। আর অকুশল কর্মের হেতু উৎপন্ন না হলে অসৎ কর্ম সম্পাদনের প্রশ্ন আসেনা, আর অসৎ কর্ম সম্পাদিত না হলে মুক্তির পথ আপনিই প্রশস্ত হয়ে যায়।

চিত্তে কুশল চেতনা কিভাবে উৎপন্ন হবে? দান, শীল, ভাবনা, সেবা, ধর্ম শ্রবন ইত্যাদি দ্বারা কুশল কর্ম সম্পাদিত হয়। শ্রদ্ধাপূর্বক বুদ্ধ শাসনে বা ধর্মের নামে দান করাকে শ্রদ্ধাবান বুঝায়। মৃত জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দান মৃত ব্যক্তি গণ প্রাপ্ত না হলেও এই দান ব্যর্থ হয় না। প্রকৃত দানের ফল কখনও বৃথা হয় না। শ্রদ্ধার সহিত দানও একটি কুশল কর্ম। তাই বৌদ্ধ ধর্মে কুশল কর্মের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সব ধরণের কুশল কর্মের মধ্যে দান একটি মহৎ বিষয়। দানের ফলে আমরা ইহ এবং পরজন্মে সুফল লাভ করতে পারি। বোধিসত্ত্ব দান ও সৎকর্ম সম্পাদন করে জন্ম জন্মান্তরে বুদ্ধত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সৎকর্মের ফল ইহ জন্মে ভোগ করতে না পারলেও পরজন্মে হলেও তার ফল বৃথা হয় না। এ জন্য সৎকর্মে নিয়োজিত হলে মানুষের মুক্তি সুদূর অবস্থানে নয়। মুক্তি বলতে কোন মঙ্গল লোকে গমন বুঝায় না, স্বর্গে গিয়ে সুখলাভ বুঝায় না। কারণ ঐ সমস্ত অবস্থান থেকে পূণ্য কর্মের ক্ষয় হলে আবার জন্ম নিতে হয়। কিন্তু প্রকৃত মুক্তি হচ্ছে নির্বান। বৌদ্ধ ধর্মে নির্বাণ লাভ হচ্ছে চরম লক্ষ্য। তবে প্রকৃত সৎকর্ম ব্যতীত এই মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। তাই কর্ম ও কর্মফলকে বৌদ্ধ ধর্মে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

অপ্রমাদে রত হও, স্বীয় চিত্তকে সাবধানে রক্ষা কর এবং আপনাকে পঙ্কে মগ্ন কুঞ্জরের ন্যায় (নিজেকে) দুর্গতি হইতে রক্ষা কর॥
–"ধম্মপদ"

প্রমাদ ও অপ্রমাদ

শ্রীমৎ বুদ্ধশ্রী স্থবির
অধ্যক্ষ
সুবলং জুরাছড়ি শাখা বন বিহার

প্রমাদ মৃত্যুর পথ আর অপ্রমাদ অমৃতের পথ। প্রমত্ত ব্যক্তিরা জীবিত থেকেও মৃতবৎ। কিন্তু অপ্রমত্ত ব্যক্তিরা লাভ করেন অমরত্ব। এ সত্যকে বিশেষ ভাবে জেনে যারা অপ্রমত্ত হয়ে আর্যদের পথ অনুসরণ করেন সেই ধ্যাননিষ্ঠ, সতত উদ্যোগী, দৃঢ় পরাক্রমশীল ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরম শান্তি রূপ নির্বাণ লাভ করেন। সৎ কাজে উৎসাহ, উদ্যোম ও স্মৃতিশীলতা নিয়ে অবিচল থাকাই হচ্ছে অপ্রমাদ। দান, নিঃস্বার্থ সেবা, পরোপকার, ক্ষমা-মৈত্রী-দয়া-ধৈর্য-সহনশীলতার মধ্য দিয়ে পূণ্য কর্ম সম্পাদন করা আবহমান কাল থেকেই জন সমাজে প্রশংসিত হয়ে আসছে। আর এ সব পূণ্য কর্ম না করে যারা আলস্যে দিন কাটায় ও অকুশল কর্ম সম্পাদন করে তারা সমাজে স্বভাবতই নিন্দনীয়। অপ্রমাদ বা সদা জাগ্রত ব্যক্তি সর্বদা সৎকর্মে ও সৎচিন্তায় রত থাকেন। তৃষ্ণা, ভোগাকাঙ্খা ইত্যাদি তিনি সযত্নে পরিহার করে চলেন। সৎ জীবন-যাপন করে পরিপূর্ণ উৎসাহে যিনি আপন পথে অগ্রসর হন তাঁর স্বীয় লক্ষ্যে পৌঁছতে দেরী হয় না। তাই বলা হয়েছে যাবতীয় কুশল কর্ম অপ্রমাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়।

অপ্রমাদ বুদ্ধ দর্শনের মূল ভিত্তি। এর মধ্যেই বুদ্ধের সমস্ত শিক্ষার সারমর্ম খুঁজে পাওয়া যায়। নির্বাণ লাভের জন্য প্রত্যেকের অপ্রমাত্ততা আবশ্যক। ত্রিপিটকে ভিক্ষুগণকে অপ্রমাদ পরায়ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে ভগবান বুদ্ধের অন্তিম উপদেশের মধ্যে এই অপ্রমাদের প্রাধান্যই দৃষ্ট হয়। যত প্রকার সবল প্রাণীর পদচিহ্ন আছে, তন্মধ্যে হস্তি পদ চিহ্নই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। সেইরূপ যত প্রকার কুশল কর্ম আছে, তন্মধ্যে অপ্রমাদই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অপ্রমাদ ব্যতীত স্মৃতির অনুশীলণ সম্ভবপর নহে। অপ্রমাদের মূল লক্ষ্য স্মৃতিকে জাগ্রত করা। কারণ স্মৃতির অনুশীলণ ব্যতীত নির্বাণ লাভ সুদূর পরাহত। স্মৃতি নিজকে দৌবারিকের ন্যায় পাহারা দেয়। তাই ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করে বলেছিলেন– "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা স্মৃতি সহকারে বাস কর। ইহাই আমার অনুশাসন।"

উদাসীন ও প্রমাদ পরায়ণ ব্যক্তির স্মৃতি জাগ্রত থাকা সম্ভবপর নহে। যারা অপ্রমাদ পরায়ণ হয়ে স্মৃতিকে জাগ্রত রাখেন তাঁরাই অমৃত পথ প্রাপ্ত হন। অপ্রমাদ শব্দের মূল অর্থ জাগ্রত ভাব। উত্থান শীলতা, উদ্যম, উৎসাহ প্রভৃতি। আর প্রমাদ হল মৃত্যুর পথ স্বরূপ। সুতরাং প্রমাদ মৃতবৎ আর অপ্রমাদ মৃত্যুঞ্জয়ী। অপ্রমত্ত ব্যক্তিরা বীর্যবান, স্মৃতিবান, সংযত ও শীলবান হয়ে ধর্ম জীবন

যাপন করেন। তাঁরা সংসার সমুদ্রে নিজের সুকর্মের দ্বারা এমন এক আশ্রয় স্থল নির্মাণ করেন যা সংসার স্রোত ভাসায়ে নিয়ে যেতে পারে না।

মূর্খ ব্যক্তিগণ প্রমাদের অনুসরণ করে বহু অকুশল কর্ম সম্পাদন করে মহা দুঃখ ভোগ করতে থাকে। বিজ্ঞ ব্যক্তি পরম সম্পদের মত অপ্রমাদকে রক্ষা করেন এবং প্রমাদকে বিষবৎ পরিত্যাগ করেন। প্রমত্ত ও অপ্রমত্তের মধ্যে বহু পার্থক্য বিদ্যমান। প্রমত্ত ব্যক্তির জীবন দুর্বিসহ এবং অপ্রমত্ত ব্যক্তি সর্বদা সুখে বাস করেন। প্রমত্ত ব্যক্তির অবর্ণ, অকীর্তি, অপ্রশংসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অপ্রমত্ত ব্যক্তির বর্ণ, কীর্তি, প্রশংসা সর্বদিকে বিস্তার লাভ করে।

দ্রুতগামী অশ্ব যেমন দূর্বল অশ্বকে অতিক্রম করে সেরূপ অপ্রমত্ত ব্যক্তিরাও প্রমত্ত ব্যক্তিকে পশ্চাতে ফেলে চলে যান। দেবরাজ ইন্দ্র অপ্রমাদের দ্বারাই দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেন। বুদ্ধগণ প্রমাদকে সর্বদা নিন্দা এবং অপ্রমাদকে সর্বদা প্রশংসা করেন। প্রমাদ পরায়ণ ব্যক্তি অত্যাধিক কামনা বাসনায় আকৃষ্ট হয়ে নীচু যোনিতে অথবা নরকে জন্ম লাভ করে সর্বদা মহাদুঃখ ভোগ করে। পক্ষান্তরে অপ্রমত্ত ব্যক্তি ইহজীবনে সর্বদুঃখের অবসান করতঃ নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করেন। অপ্রমত্ত ও অবিরাম প্রচেষ্টা পরায়ণ ভিক্ষুর পতন হতে পারে না। তিনি কখনও আর্যমার্গ ফল লাভ থেকেও বঞ্চিত হন না। তিনি ক্রমাগত চেষ্টা করতে থাকলে ইহ জীবনে সম্পূর্ণ তৃষ্ণা ক্ষয় করতে না পারলেও নির্বানের কাছাকাছি অবস্থান করতে সক্ষম হন। সে জন্য ভগবান বুদ্ধ অপ্রমাদ সম্বন্ধে বলেছিলেন– "হে ভিক্ষুগণ, একটি পুনঃ ভাবনা করিলে, ঐহিক পারত্রিক উভয় লোকের হিতার্য সাধনে সংস্থিত হয়।

পরিনির্বাণের পূর্ব মূহুর্তে ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন–

"হন্দাদানি ভিক্খবে, আমন্তযামী বো,

বস ধম্মা সঙযারা আপ্পমাদেন সম্পাদে থা"।

হে ভিক্ষুগণ, আমি এখন তোমাদিগকে এ কথা নিশ্চয়ই জানাইতেছি যে, সংসারে যাবতীয় সংস্কার ধর্ম ক্ষয় ও ব্যয়শীল। সুতরাং তোমরা অপ্রমাদের সহিত আমার দেশিত বাণী সম্পাদন বা পালন কর।

ঐহিক পারত্রিক হিত ও সুখপ্রদ কুশল ধর্ম অপ্রমত্তভাবে সম্পাদন করাই উত্তম মঙ্গল। যেহেতু পূণ্য ক্রিয়া সমূহের মধ্যে পণ্ডিতগণ অপ্রমাদকেই প্রশংসা করে থাকেন। অপ্রমাদ দ্বারাই আয়ু, আরোগ্য, বর্ণ, উচ্চ কুলীনতা, স্বর্গ অথবা নির্বাণ সুখ লাভ করা যায়। সেহেতু সকলেরই অপ্রমাদের সহিত ধর্মাচরণ করা কর্তব্য।

মানব জন্ম লাভ দুষ্কর, মানবজীবন বিপদ সংকুল। সদ্ধর্মশ্রবন আয়াস সাধ্য, বুদ্ধদের আবির্ভাব সহজ নহে।
–"ধম্মপদ"

অষ্টবিংশতি বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সংকলনেঃ সুকৃতি দেওয়ান
মহাজন পাড়া

দেশনায় অথবা বিভিন্ন গ্রন্থে ২৮ (আটাশ) বুদ্ধ বলে একটা কথা জানা যায়। কিন্তু সেই ২৮ বুদ্ধ আদতে কি বা কাঁরা সে সম্পর্কে অনেকের স্পষ্ট ধারণা অনুপস্থিত। তাই সেই ২৮ বুদ্ধের পরিচিতি প্রয়োজনীয়তার আলোকে ইহা সংকলিত। উল্লেখ থাকা দরকার যে, প্রথম ৪(চার) জন বুদ্ধ একই কল্পে আভির্ভূত হয়েছিলেন বলে ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লেখিত। তন্মধ্যে প্রথমত (তিন) জন বুদ্ধের সময়ে আমাদের (বর্তমান) গৌতম বোধিসত্ব আভির্ভাবের কোন বিবরণ পাওয়া যায়নি। সেহেতু উক্ত তিন জন সম্বুদ্ধের বিস্তারিত বিবরন সম্ভবপর নয়। সুতরাং ২৮ বুদ্ধের নাম উল্লেখ সহ মোট ২৫ বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হল।

১. **স্মরনাঙ্কর বুদ্ধ**
২. **মেধাংকর বুদ্ধ**
৩. **তৃষ্ণাঙ্কর বুদ্ধ**

৪. **দীপঙ্কর বুদ্ধ ঃ** পিতা- সুদেব ক্ষত্রিয়, মাতা- সুমেধা, জন্ম-রম্যবতী নগর, দেহের উচ্চতা- ৮০ হাত, ধ্যান- পাপ্পলীবৃক্ষ, অগ্রশ্রাবক- সুমঙ্গল ও তিষ্য, অগ্রশ্রাবিকা- নন্দা ও সুনন্দা। গৌতমবুদ্ধ তৎকালে ছিলেন জটিল সন্ন্যাসী।

৫. **কৌণ্ডিন্য বুদ্ধ ঃ** পিতা- সুনন্দ ক্ষত্রিয়, মাতা- সুজাতা দেবী, জন্ম-রম্যবতী নগর, দেহের উচ্চতা- ৮৮ হাত, ধ্যান- শালকন্যান বৃক্ষ, অগ্রশ্রাবক- ভদ্র ও সুভদ্র, অগ্রশ্রাবিকা-তিষ্যা ও উপতিষ্যা। গৌতম বুদ্ধ তৎকালে ছিলেন বিজিতাবি রাজা।

৬. **সুমঙ্গল বুদ্ধ ঃ** পিতা- উত্তর ক্ষত্রিয়, মাতা- উত্তরা, জন্ম- উত্তরা নগর, দেহের উচ্চতা- ৮৮ হাত, ধ্যান নাগবৃক্ষ, অগ্রশ্রাবক-সুধেব ও ধর্মসেন, অগ্রশ্রাবিকা- সীবলী ও অসোকা। তৎকালিন গৌতম বুদ্ধ ছিলেন সুরুচি ব্রাহ্মন।

৭ **সুমন বুদ্ধ ঃ** পিতা- রাজা সুদত্ত, মাতা- শ্রীমা, জন্ম-খেম নগর, দেহের উচ্চতা- ৯০ হাত, ধ্যান- নাগ বৃক্ষ, অগ্রশ্রাবক-সরন ও ভাবিত, অগ্রশ্রাবিকা- সোনা ও উপসোনা। গৌতম বুদ্ধ তৎকালে ছিলেন নাগ রাজা অতুল।

৮. **রেবত বুদ্ধ ঃ** পিতা- বিপুল ক্ষত্রিয়, মাতা- বিপুলা, জন্ম-ধন্যবতী নগর, দেহের উচ্চতা- ৮০ হাত, ধ্যান- নাগ বৃক্ষ, অগ্রশ্রাবক-বরুন ও বক্ষদেব, অগ্রশ্রাবিকা- ভদ্র ও সুভদ্রা। গৌতম বুদ্ধ তৎকালে ছিলেন অতিদেব ব্রাহ্মন।

৯. **শোভিত বুদ্ধ ঃ** পিতা- সুধর্ম ক্ষত্রিয়, মাতা- সুধর্ম্মা, জন্ম- সুধর্ম্ম নগর, দেহের উচ্চতা-৫৮ হাত, ধ্যান- নাগেশ্বর বৃক্ষ, অগ্রশ্রাবক- অসম ও সুনেত্র, অগ্রশ্রাবিকা- নকুলা ও সুজাতা। গৌতম বুদ্ধ তৎকালে ছিলেন- অজিত ব্রাহ্মন।

১০. **অনোমাদর্শী বুদ্ধ ঃ** পিতা-রাজাযশবা, মাতা- যশোধরা, জন্ম-চন্দ্রাবতী নগর, দেহের উচ্চতা- ৫৮ হাত, ধ্যান- অর্জ্জুন বৃক্ষ, অগ্রশ্রাবক-নিসভ ও অনোম, অগ্রশ্রাবিকা- সুন্দরী ও সুমনা। গৌতম বুদ্ধ তৎকালে ছিলেন-

১১. **পদুম বুদ্ধ ঃ** পিতা- রাজা অসম, মাতা- অসমা রানী, জন্ম- চম্পক নগর, দেহের উচ্চতা- ৫৮ হাত, ধ্যান- শোন বৃক্ষ, অগ্রশ্রাবক- সাল ও উপসাল, অগ্রশ্রাবিকা- রমাও সুরমা। গৌতম বুদ্ধ তৎকালে ছিলেন- সিংহ।

১২. **নারদ বুদ্ধ ঃ** পিতা-সুমেধ ক্ষত্রিয়, মাতা-অনমাবতী, জন্ম- ধনবতী নগর, দেহের উচ্চতা- ৮৮ হাত, ধ্যান- মহাশোন বৃক্ষ, অগ্রশ্রাবক-ভদ্রশীল ও জিত মিত্র, অগ্রশ্রাবিকা- উত্তরা ও ফাল্গুনী। গৌতম বুদ্ধ তৎকালে ছিলেন-ঋষি প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত।

১৩. **পদুমুত্তর বুদ্ধ ঃ** পিতা- রাজা আনন্দ ক্ষত্রিয়, মাতা- সুজাতা, জন্ম- হংসবতী নগর, দেহের উচ্চতা- ৮৮ হাত, ধ্যান- শাল বৃক্ষ, অগ্রশ্রাবক- দেবল ও সুজাত, অগ্রশ্রাবিকা- অমিতা ও অসমা। গৌতম বুদ্ধ তৎকালে ছিলেন-মহারাষ্ট্রীয় জটিল সন্ন্যাসী।

১৪. **সুমেধ বুদ্ধ ঃ** পিতা- রাজা সুদত্ত, মাতা-সুদত্তা, জন্ম- সুদর্শন নগর, দেহের উচ্চতা-৮৮ হাত, ধ্যান- সহনিম্ব বৃক্ষ, অগ্রশ্রাবক- শরন ও সর্বকাম, অগ্রশ্রাবিকা- রামা ও সরামা। গৌতম বুদ্ধ তৎকালে ছিলেন-উত্তর নামক মানব এবং ৮০ কোটি ধন ত্যাগ করে প্রব্রাজিত হয়েছিলেন।

১৫. **সুজাত বুদ্ধ ঃ** পিতা-উগ্গত রাজা, মাতা-প্রভাবতী, জন্ম সুমঙ্গল নগর, দেহের উচ্চতা-৫০ হাত, অগ্রশ্রাবক-সুদর্শন ও দেব, অগ্রশ্রাবিকা-নাগা ও নাগস মালা। গৌতম বুদ্ধ তৎকালে ছিলেন-চক্রবর্তী রাজা।

১৬. **প্রিয়দর্শী বুদ্ধ ঃ** পিতা-রাজা সুধন্য, মাতা-সুচন্দা, জন্ম- অনোম নগর, দেহের উচ্চতা-৮০ হাত, ধ্যান-প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ, অগ্রশ্রাবক-পালিত ও সর্ব্বদর্শী, অগ্রশ্রাবিকা- সুজতা ও ধর্ম্মদিন্না। গৌতম বুদ্ধ তৎকালে ছিলেন-কাশ্যপ ব্রাহ্মন।

১৭. **অর্থদর্শী বুদ্ধ ঃ** পিতা- সাগর ক্ষত্রিয়, মাতা-সুদর্শনা, জন্ম-শোভিত নগর, দেহের উচ্চতা- ৮০ হাত, ধ্যান- চম্পক বৃক্ষ, অগ্রশ্রাবক-সন্ত ও উপসন্ত, অগ্রশ্রাবিকা- ধর্ম্মা ও সুধর্ম্মা। গৌতম বুদ্ধ তৎকালে ছিলেন-সুশীন নামক মহাঋদ্ধিবান তাপস।

১৮. **ধর্ম দর্শীবুদ্ধ ঃ** পিতা-রাজা সরন, মাতা- সুনন্দা, জন্ম- সরন নগর, দেহের উচ্চতা-৮০ হাত, ধ্যান-রক্ত করুবক বৃক্ষ, অগ্রশ্রাবক- পদুম ও পুস্যদেব, অগ্রশ্রাবিকা- খেমা ও সর্বনামা। গৌতম বুদ্ধ তৎকালে ছিলেন-দেব রাজ ইন্দ্র।

১৯. **সিদ্ধার্থ বুদ্ধ ঃ** পিতা- জয়সেন , মাতা- সুফর্শা, জন্ম- বেভার নগর, দেহের উচ্চতা-৬০ হাত, ধ্যান-কর্নিকা বৃক্ষ, অগ্রশ্রাবক-সম্বহুল ও সুমিত্র, অগ্রশ্রাবিকা-সীবলী ও সরমা। গৌতম বুদ্ধ তৎকালে ছিলেন-মঙ্গল নামক তাপস।

২০. **তিষ্য বুদ্ধ ঃ** পিতা- জনছন্দ ক্ষত্রিয়, মাতা- পদুমা, জন্ম- খেম নগর, দেহের উচ্চতা- ৬০ হাত, ধ্যান-অসন বৃক্ষ, অগ্রশ্রাবক-ব্রহ্মদেব ও উদয়, অগ্রশ্রাবিকা- ফুস্যা ও সুদত্ত। গৌতম বুদ্ধ তৎকালে ছিলেন-সুজাত নামক ক্ষত্রিয়।

২১. **ফুস্স বুদ্ধ ঃ** পিতা-রাজা জয় সেন, মাতা- শ্রীমা রানী, জন্ম- কাশী নগর, দেহের উচ্চতা- ৫৮ হাত, ধ্যান-আমলক বৃক্ষ, অগ্রশ্রাবক- সুরক্ষিত ও ধর্মসেন, অগ্রশ্রাবিকা -চালা ও উপচালা। গৌতম বুদ্ধ তৎকালে ছিলেন-বিজিতাবী নামক ক্ষত্রিয়।

২২. **বিপস্সী বুদ্ধ ঃ** পিতা-রাজা বন্ধুমা, মাতা- বন্ধুমতি, জন্ম- বন্ধুমতি নগর, দেহের উচ্চতা- ৮০ হাত, ধ্যান- পাটলী বৃক্ষ, অগ্রশ্রাবক- খন্ধ ও তিষ্য, অগ্রশ্রাবিকা- চন্দ্রা ও চন্দ্রমিত্রা।

২৩. **সিখী বুদ্ধ ঃ** পিতা- অরুন ক্ষতিয়, মাতা-প্রভাবতী, জন্ম-অরুনবতী নগর, দেহের উচ্চতা- ৭০ হাত, ধ্যান- পুণ্ডরিক বৃক্ষ, অগ্রশ্রাবক-অভিভু ও সম্ভব, অগ্রশ্রাবিকা- সিথিলা ও পাদুমা। গৌতম বুদ্ধ তৎকালে ছিলেন-অরিন্দম রাজা।

২৪. **বেস্সভু বুদ্ধ ঃ** পিতা- রাজা সপ্পতীত, মাতা- যশোবতী, জন্ম- অনুপম নগর, দেহের উচ্চতা-৬০ হাত, ধ্যান-শালবৃক্ষ, অগ্রশ্রাবক- সোন ও উত্তর, অগ্রশ্রাবিকা- দামা ও সমালা। গৌতম বুদ্ধ তৎকালে ছিলেন- সুদর্শন রাজা।

২৫. **কুকুসন্দ বুদ্ধ ঃ** পিতা-অগ্নি দত্ত ব্রাহ্মন, মাতা-বিশাখা, জন্ম-খেম নগর, দেহের উচ্চতা-৪০ হাত, ধ্যান-সিরিশ বৃক্ষ, অগ্রশ্রাবক- বিধুর ও সঞ্জীব, অগ্রশ্রাবিকা সামা ও চম্পকা। গৌতম বুদ্ধ তৎকালে ছিলেন-খেম রাজা।

২৬. **কোণা গমন বুদ্ধ ঃ** পিতা-যজ্ঞদত্ত ব্রাহ্মন, মাতা-উত্তরা, জন্ম-শোভাবতী নগর, দেহের উচ্চতা- ৩৭ হাত, ধ্যান-উদুম্বর বৃক্ষ, অগ্রশ্রাবক-ভিষোশ ও উত্তর। অগ্রশ্রাবিকা-সমুদ্রা ও উত্তরা। গৌতম বুদ্ধ তৎকালে ছিলেন- পর্বত রাজা।

২৭. **কাশ্যপ বুদ্ধ ঃ** পিতা- ব্রহ্মদত্ত ব্রাহ্মন, মাতা-ধনবতী, জন্ম- বারানসী নগর, দেহের উচ্চতা ২০ হাত, ধ্যান নিগ্রোধ বৃক্ষ, অগ্রশ্রাবক-তিষ্য ও ভরদ্বাজ, অগ্রশ্রাবিকা- অতুলা ও উরুবেলা, গৌতম বুদ্ধ তৎকালে ছিলেন-জ্যোতিপাল ব্রাহ্মন।

২৮. **গৌতম বুদ্ধ ঃ** পিতা- শুদ্ধোধন, মাতা- মহামায়া, জন্ম কপিলাবস্তু নগর। দেহের উচ্চতা-১২ হাত, ধ্যান-অশ্বত্থ বৃক্ষ, অগ্রশ্রাবক-সারিপুত্র ও মোগ্গলায়ন, অগ্রশ্রাবিকা- ক্ষেমা ও উৎপলাবর্ণা।

●●

কর্মই গতি

সোনা রঞ্জন তালুকদার
প্রধান শিক্ষক,
কাট্টলতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

বৌদ্ধ ধর্মের মূল ভিত্তি কর্মবাদ। জীবগন কর্ম হেতু উৎপন্ন হয়। কার্মের তারতম্য অনুসারে ভাল-মন্দ সংঘটিত হচ্ছে। সুকর্ম সুখকর ও আনন্দ দায়ক।

পূণ্যবান ব্যক্তিরা আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। তাঁদের পক্ষে নির্বাণ লাভের পথও প্রশস্ত হয়। সুকর্মের খ্যাতিমানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। সৎকর্ম ব্যাতিত মানুষ সুখী হতে পারেনা।

কুকর্ম অনিষ্টকর ও দুঃখদায়ক । পাপীরা কুকর্মে লিপ্ত থাকে। তারা সকলের নিন্দার পাত্র। যারা লোভী, হিংসা পরায়ণ, মোহের বশবর্তী ; তারাই দুষ্কর্ম করে। অপরকে সৎকর্ম সম্পাদনে উৎসাহিত করেনা।

জীবনের অপূর্ণতা ও দুর্ভাগ্যের জন্য অপরকে দোষ দেয়া যায় না। যার দুঃখ সে নিজেই সৃষ্টি করে। নিজের কুকর্মের জন্য নিজেই দুঃখ ভোগ করে। মা-বাবা, আত্মীয় স্বজন কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না। ছেলে-মেয়েরা সৎপথে জীবন গঠন করলে মা-বাবাও প্রশংসিত হয়। তাই তথাগত বুদ্ধ উপদেশ দিয়েছেন- নিজেই নিজের ত্রানকর্তা, অপর কেউ নয়। স্বর্গ-নরক নিজেদেরই কর্মের পরিণতি। সে জন্য বলা হয়েছে-

সুকর্ম কুকর্ম হেথা উভয় প্রধান,
তাদের সহযোগে জীব সদা ভাসমান।
একদিকে পূর্ণশান্তি পূর্ণতার দ্বার,
বির্নিমুক্ত; অন্যদিকে নিরয় অপার।
যার যেদিকে ভার সেদিকে প্রয়াণ,
কর্ম অনুযায়ী গতি নিয়তি বিধান।

সর্বদা ধর্মপথ ও ন্যায়পথ অনুসরণ করা। অধর্ম ও অন্যায় পথ মানুষকে বিপদগামী করে। মানুষ ধর্মত সুন্দর জীবন গঠন করে পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করতে পারে। পূণ্যবান ও শীলবান ব্যক্তিগণকে দেবতারাও শ্রদ্ধা করেন। এটাই ধার্মিক ব্যক্তির উত্তম পুরস্কার। তাঁদের জন্য স্বর্গের দ্বার খোলা থাকে। যারা সন্ত্রাস করে, কুকর্মে লিপ্ত হয়, অপরকে বিপদগ্রস্থ করে তারা সমাজকে পর্যন্ত কলুষিত করে। এ সমস্ত কুকর্মের ফল ইহকালে ভোগ করতে হয়। এ জন্য কবি বলেছেন–

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর,
মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর।

বৌদ্ধ সাহিত্যে বিভিন্ন স্বর্গের বর্ণনা আছে। যেমন - দেবলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি। দেবলোকে দেবতারা বাস করেন। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাগণ অবস্থান করেন।

অন্যদিকে বৌদ্ধ সাহিত্যে চারটি অপায়ের বর্ণনা আছে। তা হচ্ছে– তীর্যক, প্রেত, অসুর ও নিরয়। যারা পাপী তারাই এসবে জন্মগ্রহণ করে।

এ বিষয়ে নিম্নে দু'টো নীতিগল্প সন্নিবেশিত হল। একটি হল পূণ্যবান ব্যক্তির কাহিনী এবং অন্যটি পাপের পরিণাম সম্পর্কিত।

একঃ

শ্রাবস্তীতে একজন ধার্মিক উপাসক ছিলেন। তিনি স্বপরিবারে সৎপথে জীবন-যাপন করতেন। সৎকর্ম সম্পাদনই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। কোনদিন উপোসথ ভঙ্গ করতেন না। তাঁর গুণাবলী দেখে সবাই মুগ্ধ হত। উপাসক বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু শয্যায় শায়িত হলেন। তিনি তাঁর ছেলেকে ডেকে বললেন– "বাবা, বিহারে যাও। ভগবান বুদ্ধকে নিবেদন কর আমার ধর্ম শ্রবণের ইচ্ছে হয়েছে। আটজন ভিক্ষুর প্রয়োজন।" বুদ্ধ ভিক্ষু পাঠালেন। ভিক্ষুগণ এসে উপাসকের পাশে বসে সূত্রপাঠ আরম্ভ করলেন। উপাসক তন্ময় হয়ে শুনছিলেন। এ সময় ছয় দেবলোক থেকে ছয় জন সারথি রথসহ তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁরা স্ব স্ব দেবলোকের সুখের বর্ণনা দিয়ে রথে উঠার সাদর আহ্বান জানালেন। উপাসক সারথিদের উদ্দেশ্যে বললেন- "আপনারা থামুন, আমার ধর্ম শ্রবণের ব্যাঘাত হচ্ছে।" একদিকে উপাসকের ছেলে মেয়ে মনে করল, তাদের পিতা মৃত্যু ভয়ে প্রলাপ বকছেন। ভিক্ষুগণ মনে করলেন, তাঁদের সূত্রপাঠ করতে নিষেধ করছেন। তাই তারা চলে গেলেন।

উপাসক স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে ছেলে-মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, " তোমরা কাঁদছ কেন? ভিক্ষুরা কোথায়?" তারা সব খুলে বলল। উপাসক বললেন, আমি রথের সারথিদের কথা বলছি। তারা আমাকে দেবলোকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছে। এ কথা বলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তিনি তুষিত স্বর্গে দেব পুত্র হিসেবে জন্ম নিয়ে দিব্য সুখ উপভোগ করতে লাগলেন।

দুইঃ

এক সময় মোদ্গলায়ন স্থবির রাজগৃহের গৃধ্রকুট পর্বতে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর আশ্রমের পাশে একটি বিরাট অজগর প্রেত বাস করত। তার সর্বাঙ্গ অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছিল। স্থবির অজগরের অবস্থা দেখে সে স্থান ত্যাগ করলেন। তখন বুদ্ধ স্থবিরকে এ প্রেতের পূর্ব জন্ম বৃত্তান্ত বললেন।

অজগর কশ্যপ বুদ্ধের সময় মনুষ্যকূলে জন্ম গ্রহণ করেছিল। সে অধার্মিক ছিল। দস্যুবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করত। তাই সে দুবৃত্ত নামে পরিচিত হয়। তখন সুমঙ্গল নামে এক শ্রেষ্ঠী বুদ্ধ ভক্ত ছিলেন। দুবৃত্ত শ্রেষ্ঠীর ভীষণ ক্ষতি করেছিল। তাঁর সর্বস্ব লুণ্ঠন করে বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সেই পাপের ফলেই অজগর প্রেত রূপে জন্ম নিয়ে অগ্নিদগ্ধ হচ্ছিল। এ প্রসংগে বুদ্ধের উপদেশ হল–

"মূর্খ ব্যক্তি যখন পাপ কর্ম করে, তখন তা বুঝতে পারে না। কিন্তু যখন সে কৃত দুষ্কর্মের ফলে নরকে গমন করে তখন অনুতাপ করে।"

যতক্ষন পাপকর্ম পরিপক্ক না হয় ততক্ষন পাপী মঙ্গল দর্শন করে; কিন্তু পাপ যখন পরিপক্ক হয় তখন পাপী অমঙ্গল দেখিতে পায়।
–"ধম্মপদ"

কবিতা

নদীর অদূরে ঘুমন্ত কেন?

শ্রীমৎ সঙ্ঘসার ভিক্ষু
কাঁটাছড়ি অরন্য কুঠির।

সন্নিকটস্থ বয়েই চলেছে,
পাপামল বিধৌতের 'নদী'-
উত্থিত বদনে সদায় ডাকিয়া মোরে
বনভান্তে কহিছে- হে তুমি!

একি! সবি যে ঘুমন্তে বিভোর
উঠে এসো মোর তটে, সূদূরে আর নয়-
দেখো! বিশ্ব-মাঝে কি ঐ-
জানো কি আভা-সমীরণ বয় ॥

করগো আত্ম-বিধৌত স্বাচ্ছন্দ বিমল জ্ঞানে,
হও ধর্ম্ম সুধার নিয়ত আহারী-
লভিবে সম্যক জ্ঞান "ত্যাজিয়া পাপামল"।
জ্ঞানা-লোয় সাজাও - এ নিখিল ধরনী ॥

দেখো! বিমুক্তির ছায়ার ছাপ, সুশীতল,
সুনিবিড় এই প্রজ্ঞালয়-
খুঁজিয়া লভিবে প্রানপনে তায়
আচরিয়া ত্যাজিবে এ' বিশ্বময় ॥

পাপামলে ডুবন্ত কেন?
দৃষ্টতঃ হাহাকার কলরব-
পান করো-মোর অমর সুধা,
চির শান্তিতে থাকো সু-নীরব ॥

হেনকালে মোর গোচর, "দগ্ধ-বিদগ্ধ"
বিশ্ব প্রাণী ভোগিছে যন্ত্রনায়-
কাপুরুষ হয়ে ছাড়িয়ে দিবে কি?
এই দুর্লভ মনুষ্যত্ব, - মারের অজ্ঞানতায় ॥
পূনঃ চেষ্টা- "বৃত্তি" পূনঃ করণ,
সময়েতে অসাধ্যই সাধন-
বিমলা'নন্দে পূর্ণ চন্দ্রিমায়,
আলোকিত পদে পদে তারি চরণ ॥

হে তুমি! জাগো-দেখো-জানো,
শেখাও অন্যের সেই অমর বানী-
বিশ্বসেরা বৌদ্ধধর্ম "প্রচারিয়ে সর্বজন",
স্ব-শ্রদ্ধ মহীয়ান হও কল্যাণকামী ॥

পণ্ডিত ও মূর্খের লক্ষণ

শ্রীমৎ মহামিত্র ভিক্ষু
নানিয়ার চর রত্নাংকুর বনবিহার

মূর্খ ঃ শুরুতে বলে যাবো আমি সংক্ষেপে মূর্খের পরিচয়,
যে ব্যক্তি যাহা শুনে তাহা বলে সত্য মিথ্যা অজানায়,
তাহার চরিত্র দেখে গজমূর্খ বলে জানিবে নিশ্চয়।
ধর্ম অধর্ম কি? না জানিয়া সে জানার ভান করে,
সত্য-মিথ্যা কি তাহা যদি দেখিয়া দিলে-
অঙ্গল তুলিয়া বলে, যে যার নীতিতে চলে।

সত্য-মিথ্যা জানে না বলে দুঃখী মানবগণ করে দৌড়া দৌড়ি,
দুষ্কর্ম দেখিয়ে মিথ্যা কেহ যদি বলে কুসংস্কার ফেলে দাও তাড়াতাড়ি
তবুও সে বলে উঠে, আমাকে বলে গেছে অতীতের বুড়োবুড়ি
মুর্খ মানবগণ না জানিয়া কপালে হাত দিয়ে,
ভগবান ভগবান বলে আকাশের দিকে তাকিয়ে
কিন্তু জানে না সে দুঃখ পায় কুসংস্কারের কারণে।
সমাজের কাজ কর্মে একতাবদ্ধ সম্মিলন হওয়ার কালে,
স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করে
কাজের সময় আসিবে যখন ফাঁকি দিয়ে চলে।
মুর্খ ব্যক্তি দুঃশ্চিন্তা, দুর্ভাষন, দুষ্কর্ম সম্পাদনে নিরত
বহুজনের সহিত অসুখ অনর্থ-দুঃখেরই করে সঞ্চিত
এ কারণে জ্ঞানীগণ দ্বারা হয় তিরস্কৃত।
প্রাণী হত্যা, অদত্ত গ্রহণ মুসাবাদ আর করে ব্যাভিচার
জ্ঞানীর কথন না শুনিয়া করে মিথ্যাচার
মরণের পরে নরক যন্ত্রণায় করে হাহাকার।

পণ্ডিতঃ সহ্য, ধৈর্য, ক্ষমা, মৈত্রী, দয়া নির্ভয় পন্ডিতের লক্ষণ
সে চায় নিজ পর কারো যেন পরিহানি না ঘটে কখন।
যে যাহাই বলিবে বলুক সৎপথে করিবে গমন
পর্বত রাজ সুমেরু কখন ও বায়ু চাপে নহে হিল্লোলিত
পৃথিবী সদৃশ নিন্দা প্রশংসায় পন্ডিতেরা নহে কম্পিত।
সংসারে তিনি সৎ কাজ হতে নহে বঞ্চিত।

প্রাণীগণের হস্তদন্ড, প্রস্তর খন্ড দ্বারা করে না পীড়ণ
জগতে আসিয়া বহুজনের হিতসুখ সম্পাদন করে বিহরণ
দানশীল ভাবনা দ্বারা করে সুগতি গমন।
অজ্ঞান ছেড়ে জ্ঞানচক্ষে দর্শন কর সত্য ধর্ম
হিংসা ছাড়, পুন্যকর লভিয়াছ দুর্লভ জন্ম
তোমার জন্য এ সুযোগ কর কুশল কর্ম।
এই দুর্লভ জন্ম হারালে পাবেনা পুনঃবার
মুক্তি দাতা নহে কেহ নিজেকে নিজে কর উদ্ধার
বুদ্ধ- ধর্ম সংঘের শরণে বন্ধ কর অপায় দ্বার।

বর মাঘং

পদ্মিনী দেওয়ান

নতুন বড়া দাম

মুই বর মাঘিম
যেম হ্যায়োজে কিয়ঙত
বর মাঘিম এগা মনে
লামিম জ্ঞান সাগরত।

শীল পানেম ধর্ম গোরিম
পূরণ -গোরিম মুই পারমী
নোনিয়া গোরি বর মাঘিম
পূরণ হোক ম আঝানী।

ন থাং যেন মুই অজ্ঞানত
বুদ্ধ জ্ঞান পাংপারা
ন হোক মর কন পাপ
ধর্ম জুরে অধর্ম যোক গারা
আর্য শ্রাবিকা হোয় পাত্তুং
বর মাঘং হ্যায়োজ গোরি
ও ভান্তে বর দে মরে
বিশাখা সান্ন্য উদুং ভিলি।

গম পধ্

রেখী চাকমা

পাতাছড়ি

গোরিবং দান পালেবং শীল
যেবং বন বিহারত
শুনিবং দেশনা গোরিবং পূন্য
ন হোক কাজর মনত॥
বুদ্ধর জ্ঞানে হবং জ্ঞানী
অজ্ঞান পধত ন যেবং
হিংসা পিঝুম ফেলে দিনে
মৈত্রী পধে আমি থেবং॥
বুদ্ধ আমার আযল গিরোজ
ধর্ম আমার ধুর
সংঘ আমার পধ বাত্তি
কিয়োঙ আমার পূন্য কুর॥
বুদ্ধ, ধর্ম সংঘ নাঙে
ঢালি দিবং ভক্তিয়ান
সত্য জ্ঞানে থেবং আমি
ভে লবং গম পথান॥

প্রণতি তোমায় প্রভু

সন্ধান মিত্র তালুকদার (টুটুল)

[প্রয়াত ডঃ শরনংকর ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে]

জাগাতে এসে, জাগালে মোদের
দিয়েছ ধর্ম জ্ঞান,
তোমার তুলনা তুমিই প্রভু
তুমিই প্রজ্ঞাবান।
ধর্ম পিতা হয়েই তুমি
ছিলে মোদের মাঝে,
তাইতো আজি তোমার কথা
হৃদয় মন্দিরে বাজে।
নমি প্রভু নমি তোমায়
নমি তোমার যুগল চরণে
শাশ্বত রূপে তুমি থেকো
সন্ধানের হৃদয় গগনে।

প্রতীক ও জাগরণ

জয়নী দেওয়ান
সাবেক্ষং মহাজন পাড়া

এসে ভান্তে বিশুদ্ধানন্দ,
বৌদ্ধ নর-নারীর ধরেনা আনন্দ।
পরস্পর বন্ধন যবে ছিল দুঃখভরা অন্ধকারে,
তখনি আলোর দিশারী হয়ে এলেন নানিয়ারচরে।
অধিষ্ঠিত হলেন রত্নাংকুরে-
সমবেত আজ বৌদ্ধ নর-নারী মৈত্রীর পতাকাতলে।
নির্বাণের তরে অঘোর কাননে এক জ্ঞান তাপস
সাথে লয়ে শীলবান ভিক্ষু সংঘ-
করেন পালন তিনি ধুতাঙ্গ।
চারিদিকে আজি ধর্মের গৌরব,
বহিছে মৈত্রী, শীলের সৌরভ।
মুক্তির পথ অন্বেষণের লাগি-
হলেন তিনি সর্বত্যাগী।
হয়োনা ঘুমে বিভোর আর
ধর্ম চক্ষু মেলে উঠে এসো এবার
অহিংসার পতাকা তলে
জাতি- ভেদাভেদ, হিংসা-বিদ্বেস ভুলে।
জন্ম, জ্বরা, ব্যাধি মরণে
দুঃখ ভুগে হবে ছারকার
কতকাল তুমি নিত্য সুখে
অনিত্যকে ভুলে রবে আর।
দুঃখ যদি দেয় ধরা জীবনে,
সুচিন্তা কর কায়-বাক্য-মনে।
করে সৎকর্ম ত্যাজি পাপ
নির্বাণ সুখে সুখী হবে
যদি থাকে শীলের প্রভাব।

পূণ্যর শিঁঙোর

জিতা চাকমা
বড়পুল পাড়া

এঝ বেক্কুনে আমি কিয়ঙত্ যেই।
কার'রে হিংসা-পিঝুম ন' গোরিই
বেঘে মিলি দোলে থেভং,
ধর্ম-পূণ্য গোরিভং।
এধক ভিলোন পূণ্য কারে কয়
দোলে নহ্ চিনি-
শ্রদ্ধেয় বনভান্তের শাসন এনেই
পাপ-পূণ্য কারে কয় চিনিলং।
যেক্কেনে আমি মুরিবং
সেক্কেনে আমাহ্ মরনর সমারে
কন কিচ্ছু যে-দ' নয়।
সমারে যেব বানা-
পাপ আহ্ পূণ্যয়ানি।
যিয়ানত্যায় আমি পূণ্য গোরিভং
সিয়ান পেভং হামাক্কায়
যুদি আমি মাঘি জানি বর।

অষ্টমার্গে নির্বাণ

দীপন চাকমা
ডানে সাবেক্ষ্যং

আটটি পথের দিশা দিলেন তথাগত,
সেই পথে গেলে সোজা দুঃখ যে পরাহত।
তৃষ্ণার অবসান মোক্ষ ও নির্বাণ,
পেতে পারি অষ্টমার্গে তার সন্ধান।
"সম্মা দিটঠি"-সৎ দৃষ্টি ঃ
পথের সেখানে শুরু সত্য দৃষ্টি দিয়ে,
দৃষ্টির স্বচ্ছতা দূরদর্শিতা নিয়ে।
দুঃখের শেষ চাই- এই প্রতিজ্ঞাবোধ,
ভাবনাকে করে সোজা, করে বিপদরোধ।
"সম্মা সংকপপ" - সৎ সংকল্প ঃ
স্বচ্ছ দৃষ্টিসহ সত্যের ভাবনা
মনে যেন নাহি দেয় অসৎ চিন্তা হানা।
দৃঢ় কুশল চিত্ত পূণ্য কাজের জনক,
সংকল্পে সততা তারেই বলা হউক।
"সম্মা বাচা"- সৎ বাক্য ঃ
দৃষ্টির স্বচ্ছতা, ভাবনার সরলতা,
দ্বৈত মার্গ মিলে সৎ বাক্য বারতা।
মিথ্যা বচন নয়, রুষ্ট শব্দচয়,
অপ্রীতি ভাষণ জেনো - নির্বাণ পথ নয়।
"সম্মা কম্মন্ত"- সৎ কর্ম ঃ
সৎকর্ম কর, প্রাণী হত্যা নয়,
সতত সংকল্প যেন সৎপথে রয়।
নীতিহীন কামনার ফল- জেনো বিষময়
সত্য কর্ম ফল চির সঞ্চিত রয়।
"সম্মা আজীব" - সৎ জীবন ঃ
আত্মা প্রদীপ্ত হয়ে জীবন হবে নির্বাপিত
সময় নহে অপচয়, পূণ্য কর্ম হোক সাধিত।
যথাবিহীত কর্ম এবং শ্রদ্ধাবানের পথ,
সৎ জীবনের ধ্বজা ধরে মোক্ষের রথ।
"সম্মা ব্যায়াম" - সৎ প্রচেষ্টা ঃ
সৎ জীবনে কভূ আলস্য বশে না রহ,
শীলবান সৎপথে সদা পায় উৎসাহ।
সৎ প্রচেষ্টা হতে সৎকর্ম আসে,
জন্ম - মৃত্যু , দুঃখ - জ্বরা রহে না পাশে।
"সম্মা সতি" - সৎ ভাবনা ঃ
মনের দ্বৈততা অসৎ মনোভাব
সুদূর পরাহত সতীর সাথ।
"সম্মা সমাধি" - সৎ সমাধি ঃ
শুদ্ধ মনেতে রয় সমাধির সরলতা,
প্রীতি ও কুশলবোধ এবং প্রসন্নতা।
তবেই দুঃখ -মূল হবেই হবে দূর,
অষ্টমার্গ বাণী সত্য ও সুমধুর।
এই অষ্ট আর্য্য দুঃখ মুক্তিমার্গ
চারি আর্য্য সত্যের পরশ মণি,
মার্গচিত্ত ক্ষণে বিদর্শণ জ্ঞানে
দেখে আর্য্যগণ নির্ধ্বণের খনি।

আয়ুষ্মান বিশুদ্ধানন্দ

সুরেশ চন্দ্র চাকমা
খুল্যাং পাড়া

পূজিতে তুষ্ট, শ্রদ্ধায় পরিতৃপ্ত, পরমানন্দ
আয়ুষ্মান বিশুদ্ধানন্দ।
দায়ক-দায়িকাগণে বন্দনা করে নতঃশিরে
খুশীতে দেখামাত্র।
পারমী পূরণে লভিছ ভিক্ষু জীবন,
সার্থক হয়েছে তব পার্থিবের মনুষ্য জনম।
সদ্ধর্মের সাধক তুমি তাপিতের ত্রাণ-
চিরভাস্বর তুমি বৌদ্ধ জগতে, রবে চির অম্লান।
সাম্য-মৈত্রীর লোকত্তর জ্ঞান লভিয়ে
হয়েছ কীর্তিমান,
মারকে করেছ জয়, ত্যাজিয়ে অসার
নশ্বর পৃথিবীতে তুমি এখন মহাশক্তিমান।
পরিপূর্ণ তুমি-আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্ভারে
সদা প্রস্তুত মোরা ভক্তি, শ্রদ্ধা নিবেদনে নত শিরে।
ধর্ম জ্ঞানে দীক্ষা দিতে রত্নাঙ্কুরে এলে
পঞ্চশীল জ্ঞান, চতুরার্য সত্যের দেশনায়
বুদ্ধ জ্ঞানের দীপ দিলে জ্বেলে।
নিভবে না আর সেই আলো
অধর্ম কিংবা মারের ঝড়ে
সেই আলোর রশ্মি ছড়ুক-
সবার অন্তরে।

১৯৯৭ তুমি কেমন ছিলে?

তৃষ্ণা চাকমা
নোয়াদামা পাড়া

৯৭ তুমি কেমন ছিলে
বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের কাছে?
৯৭ তুমি কেমন ছিলে
বনভান্তের কাছে?
৯৭ তুমি কেমন ছিলে
আমার শিক্ষা গুরুর কাছে?
৯৭ তুমি কেমন ছিলে
দীন-দুঃখীদের কাছে?
৯৭ তুমি কেমন ছিলে
আমার বন্ধুদের কাছে?
৯৭ তুমি কেমন ছিলে
আমার জন্ম দাতা মা-বাবার কাছে?
৯৭ তুমি কেমন ছিলে
আমার ছোট ভাইটির কাছে???
এতটুকু জবাব পার কি তুমি দিতে
নাকি পারি আমি পেতে?
তবুও প্রশ্ন রেখে গেলাম
৯৭ তোমার কাছে ॥

আরাধনা

তৃতীয়া চাকমা
ছয়কুঁড়ি বিল

ত্যাগী তুমি, জ্ঞানী তুমি, হয়েছ মহাসাধক-
করে কঠোর সাধনা,
করজোড়ে তোমায় প্রভু, জানাই বন্দনা।
সাধনা করে প্রভু তুমি, পেয়েছ যে ধন,
সবচে' দুর্লভ অমূল্য রতন।
লোভ, তৃষ্ণা, মার ভূমি
ধ্বংস করে-আত্মজয়ে বলীয়ান তুমি।
নেই শোক, নেই পিছুটান, নেই দুঃখ ভার,
জেনেছি প্রভু, এ জগতে তুমি কভু আসিবেনা আর।
অন্ধ, অজ্ঞ মোরা, নেই জ্ঞান বিচার করিবারে,
সংসার সাগরে তাইতো মোরা ঘুরি বারে বারে।
মিথ্যা এ ভব বন্ধন হতে, চাই প্রভু মুক্ত হতে,
তোমার জ্ঞানের আলোয় দূর হোক সবার
মনের যত অন্ধকার।
জ্ঞান চক্ষু উদয় হোক, জন্ম চক্র রুদ্ধ হোক।
শত্রুসম এ সংসার-
চাই না প্রভু চাই না আর।
শ্রদ্ধাভরে বন্দনা জানাই স্মরি তোমায় মনে,
নির্বাণ লাভের হেতু হোক মোদের নিত্য কর্মে।
প্রভু তুমি কৃপা করে, দাও আশীষ মোদেরে,
যেথায় আছে নিত্য সুখ
পাই যেন সে স্থান, নাম যার নির্বাণ ॥

ধর্ম দাগে জাগ'

মনিকা চাকমা (শ্রাবন্তি মা)
খুল্যাং পাড়া

নেই আর সেই আগ দিন
হাবা বুদুলী যিয়ে
সংসারত ইক্ষু বুদ্ধ নাঙ
ভর পুর হুইয়ে।

মুয়ে মুয়ে বুদ্ধর কধা
চেরোকিত্যা ধর্মর দাগ
নেই আর সে করলা নিয়ম
ছিদি যার শীল তুম্ বাঝ্।

যদি চিন' ধর্ময়ান
উজে এয' গম পধত
ফেলে দ্য ভাঞ্চে কাম
পূণ্য গোজোক বেগ'মনত।

হিংসা সেরে আর ন থিও
ধুয়া জাগাত পড়গি
অকুশল কাম ইরি দিইনে
কুশল কামানি ধরগি।

পাপ তাপ ধোই ফেলে
কাজর কাজ' মনত্তুন
ধর্মর দাগ পড়ি যিয়ে
উধি এয ঘুমত্তুন ॥

বন বিহার

অনামিকা চাকমা
মরাচেঙ্গী

একটি সুন্দর নাম, অনন্ত একটি ধাম
নাহিক হিংসা, মোহ, অনাচার।
আছে শুধু শীল, ভাবনা, প্রজ্ঞা সার-
নামটি তার "বন বিহার"।

বন বিহারের ভিক্ষু সংঘ
তারি মাঝে ধুতাঙ্গ; ধ্যানে মগ্ন
শীলবান সংঘে শরণাগত ধর্মমতি নর-নারীর-
মৈত্রীর বন্ধনে ধন্য আজি ত্রিরত্ন।

শীল ও ভাবনার তরে
একাগ্র চিত্তে গেলে বন বিহারে,
মোক্ষ গতির দ্বার যাবে খুলে
দিবা-নিশি জ্বলবে ধর্ম আলো অন্তরে।

দূর হবে অবিদ্যা আঁধার
সার্থক হবে দূর্লভ মানব জীবন,
ক্ষণেক মোহ, তৃষ্ণা ছেড়ে
মুক্ত-স্বাধীন থাকে আর্যগণ।

দুস্কর্ম, দুঃশীল, চরিত্রহীন হলে,
সব সময় পুড়বে সে পরাধীনতার অনলে।
নিজকে নিজে মুক্ত করো, দেরী নয় আর
ছয় রঙের ছায়া পেতে হলে
চলো সবে বন বিহার।

মুক্তির সুর

রত্না ও রাজ কুমারী চাকমা
পাতাছড়ি

শান্ত বাতাসে বিহারের চূড়া থেকে
ভেসে আসে যখন সূত্র পাতের সূর
পবিত্রতায় ভরে উঠে মন
মৈত্রীর একি আহ্বান
শান্তির একি-ধ্বনি
একাগ্রতায় কান পেতে শুনি॥

বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ নামের মধুর সুর
বার বার শুনি, তবু আরো শুনতে
ইচ্ছা হয় মনে নব শিহরণ জাগে প্রাণে
কেন জানি এত মধুর
মুক্তির সেই সুর॥

ভোর সন্ধ্যায় বেজে উঠে বিহারে
সূত্র পাতের গুরু গম্ভীর ধ্বনি
আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়
মানুষেতে আর ভেদাভেদ নাহি রয়
মলয় বহে মৈত্রীর সুরে
সে সুর বাজে দূরে-বহুদুরে
প্রাণের ঐ প্রান্তরে ॥

কর্ম

বীনা চাকমা
খুল্যাং পাড়া

এগা মনে ভাবঙর
পূণ্য জাগাত যেবাত্যেই
অজ্ঞান' আন্ধারত্তুন
জ্ঞান পহ্র পেবাত্যেই।
জিংকানিয়ান আমার
মিঝি আঘে ধুল্যালোই
অকুল দজ্যাত ভাঝির আমি
বুক ভরা চিদালোই।
নিত্য থেই পাপ কাম্বোই
পূণ্য কধা ভুলিনে
হাক্ষে শিঘি ভাঞ্জেয়ানী
আযল নগল ন চিনিনে।
এজান গোরি থেলে আমার
কন জম্মত ভালেত নেই
হাচ্ছেক আমার বদালে পেবং
পূণ্য জাগাত নিত্য যেই।
বিচ্চাস গোরি মানি লবং
আমা নিজ ধর্ময়ান
ভাগ্য ভিলি -কিচ্ছু নয়
আযল নিজ কর্ময়ান।
কর্ম গুনে রঝাত তলে
কর্মই বেক্ষানী
যা কর্ম- তারে ডাগে
কর্মর অধীন জিং কানি।

মুক্তির পথ

আল্পনা চাকমা
দক্ষিণ ফিরিঙ্গী পাড়া

জীব শ্রেষ্ঠ মানব জাতি পার্থিব এ জগতে
তবু কেন নিমজ্জিত মোহ-তৃষ্ণার সাগরে?
লেখা-পড়া শিখে তারা করে ডিগ্রীর অহংকার
জ্ঞান চক্ষু ফুটে না কেন অহমিকা বার বার?
ক্ষনিকের সুখ আর হীন স্বার্থের তরে
হীতাহিত জ্ঞান হারায় মানুষ পাপ কার্য করে।

দুঃখকে সুখ ভেবে ব'রে নেয় সাদরে
ভোগে তাহে বেদনায় আজীবন ভরে
ক্ষনিক সুখ চাই নাক' আর ক্ষনিক শান্তি
জন্ম জরা ব্যাধি দুঃখ দিতে হবে পাড়ি
যতই থাকি লোভ চিত্তে ততই বাড়িবে বেদনা
মোহ কভু হবে না দূর ছাড়িবে না যাতনা।

বিরাগী হই ভব জন্মে লৌকিক সুখ ত্যাজি
নির্বান লাভের কর্ম করে মুক্তির পথ খুঁজি।

হে বিশুদ্ধানন্দ

প্রতাপ চাকমা
বড়পুল পাড়া

তুমি এসেছিলে ভবে
শুধু পূর্ণ করিতে পারমী।
এসেছিলে এ পৃথিবীতে
পাপ হতে মানুষকে মুক্ত করিতে।
তুমি মুক্ত, তুমি পবিত্র, তুমি শান্ত
আত্মজয়ে করিলে মায়ার বাঁধন ছিন্ন।
অনাবিল দুঃখ ও হতাশায় মানুষ যখন ব্যথাতুর,
তখনি বাজিল তোমার শুভ আগমনীর সুর।
পেয়েছে মুক্তির পথ, গড়েছে মৈত্রীর সেতু
শীল তেজে প্রদীপ্ত আজ তোমারি আগমন হেতু।
দলে দলে আজ চলেছে সবাই সদ্ধর্মের পথে
আলোর রেখায় হয়ে আলোকিত তোমারি পশ্চাতে।

সত্য সন্ধানে

রবি রঞ্জন চাকমা
ডানে সাবেক্ষ্যং

হে, মহামানব, লভিছ জনম নির্মল সত্য সন্ধানে-
গিরি- নির্ঝর-সুশোভিত এই পাবর্ত্য জননী কুলে।
মহাজ্ঞানী তুমি শেখাইতে মানবে
সাধনানন্দ নাম করিছ ধারণ কঠোর সাধনার ফলে॥

মারের সৈন্য করিয়াছ জয় মহারথী তুমি নাহি কোন ভয়-
ঘুচাইয়াছ তুমি অন্তিম যাতনা জানি মহান যোগ বলে।
পাপী-তাপীগনে দেখাইতে পথ হইয়াছ উদয়
তোমার সুর নাহি শুনে যারা পুড়ে যাবে অনন্ত অনলে॥

নব যুগে তুমি হইয়া কর্নধার, পাড়ি দিতে আজ ভব পাড়াপাড়
লভিতে জ্ঞান তোমার পানে আসিতেছে দলে দলে।
অন্ধ আমরা, অধম আমরা দেখাও প্রভু আলোর পথ
লহ মম ভক্তি, প্রনমি তোমার যুগল চরণতলে॥

গান

রচনা ও সুর
আনন্দ প্রকাশ চাকমা

তোমা বিহার আমা বিহার
রত্নাংকুর বন বিহার
তোমা বিহার আমা বিহার
নান্যা চরর পূণ্য বিহার।
চিত জুরায় মন জুরায় ইধু এলে ধর্ম কধায়
এয বাপ-ভেই এই জাগনিত এয মা-বোন এই জাগানত
হৃদে কদালে সাজে তুলি
ধর্ম সদক ফুদে তুলি
এই পূন্যয়ান তোমার আমার।

বনভান্তে পধ দেমেল ধর্ম চোঘ ফুদে দিল
শীল পালেন্যে শুদ্ধ হৃবং মন কাজর ফেলে দিবং
ইধু য়েইন্যে রীনি চঘি
সত্য পথান তোগে লঘি
এই জাগায়ান তোমার আমার।

ইন্দু মুজুবমান বৌদ্ধ খ্রীস্টান ইধু এলে বেক সমান
অহিংসার ঠিয়িনা ইধু গম পধর মূ ইধু-
মৈত্রীর রেগা দোলে বানি
নুয়া মন্দর মনত আনি
এই জাগায়ান তোমার আমার ॥

●●

গীতিকার ঃ স্বর্গীয় চুনিলাল দেওয়ান
রচনা কাল- ১৯৩৬ ইংরেজী
সুরকার ঃ রূপায়ন চাকমা ● তাল-তেওড়া

সুদূর হতে এসেছে অতিথি
বুদ্ধ চরণে দিতে অঞ্জলী
বরণ করে লওগো তাদেরে
গ্রামবাসী তোরা সবে মিলি ॥

এসেছে অতিথি এসেছে আজিরে
বৌদ্ধ বিহারে ক্ষণ অবসরে
তাদের হেরিয়া সবাকার মোর
হৃদয় উঠিছে উছলি ॥

হে বুদ্ধ ওগো নিখিল শরণ
তাপিত জনের জীবন মরণ
নির্বান সুধা কর বরিষন
পূণ্য প্রদীপ জ্বালি ॥

ঃ শুদ্ধি পত্র ঃ

পৃষ্ঠা	লাইন	ভুল মুদ্রিত	সঠিক হবে
৩	৪	রঞ্জিত কুমার চাকমা	রঞ্জিত কুমার দেওয়ান (চাকমা)
৯	৪	কোপাও দান	কোথাও এ দান
১০	২২	আয়ুস্মান	পথিকৃৎ
১৩	১০	অত্যান্ত	অব্যক্ত
১৪	৮	৮ একর	১২ একর
২১	১৩	মগ্নসস	সগ্নসস
২২	৩০	নগনসস	নগরসস
২৬	১৯	কবালে	কালে
২৮	২	বিস্তৃতে	বিস্তৃত
২৯	১২	ঘাটান	ঘাটানো
৩২	৩৫	অজ্ঞান	অজ্ঞানে
৩২	৪০	সংগোগ	সংযোগ
৩৩	৩৭	পুরুষ	পরুষ
৩৩	১৬	পরকার	পরকাল
৩৩ ও ৩৪	৩৭ ও ১	পিন্দন	পিন্তন
৪০	৩৩	তিনটি	দু'টি
৪৩	২২	শ্রদ্ধাবান	শ্রদ্ধাদান
৪৭	৩	ছিলেন	কি ছিলেন জানা যায়নি
৪৯	১	কার্যের	কর্মের
৫০	২৭ ও ২৮	দুবৃত্ত	দুর্বৃত্ত
৫৪	৫	পানেম	পালেম
৫৭	শিরোনাম ও ১	আয়ুস্মান	পথিকৃৎ
৫৭ (১৯৯৭)		নোয়াদামা	নোয়াদাম

স্মরণ পুস্তিকা

প্রথম কঠিন চীবর দান - '৯৮
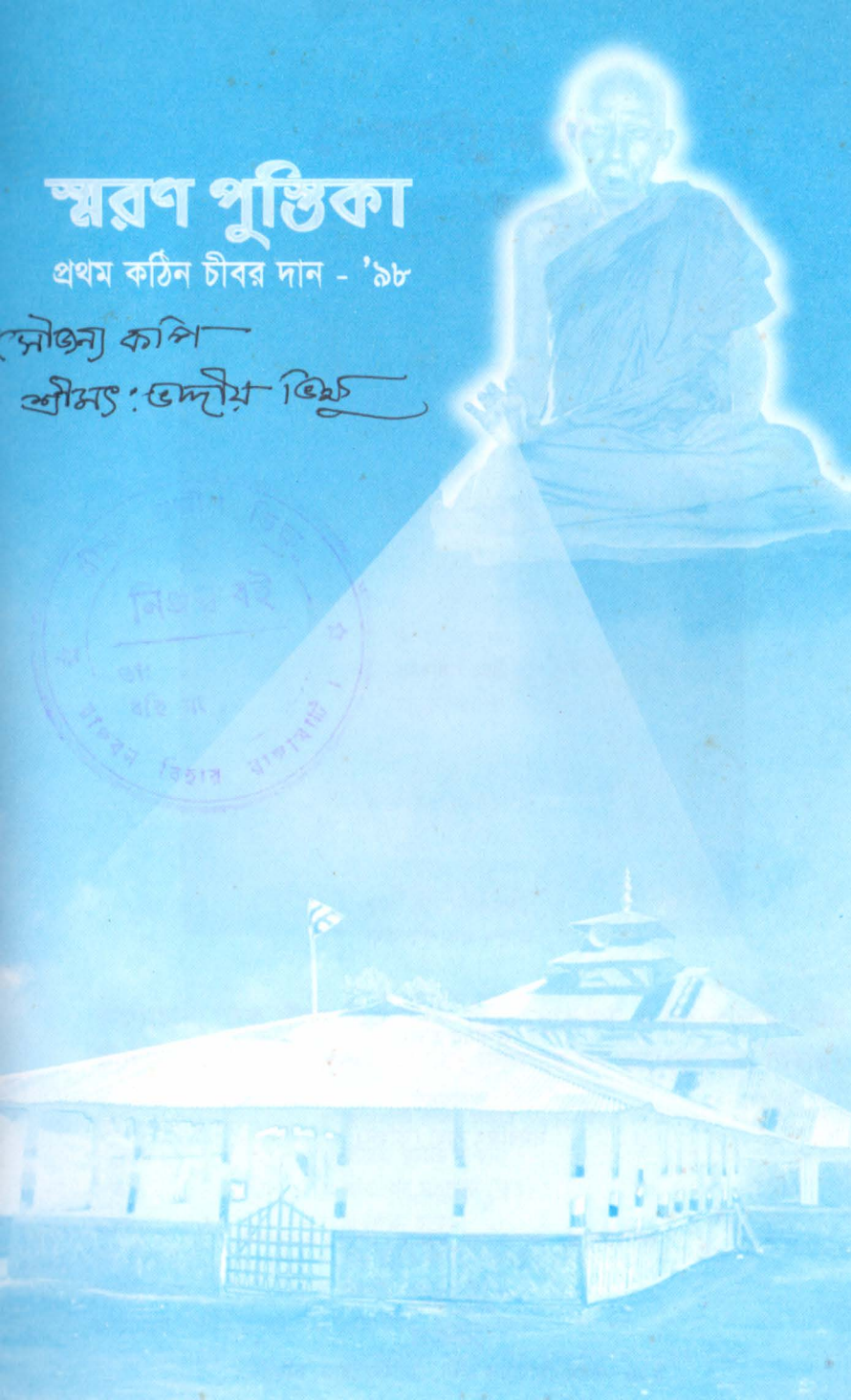
সৌজন্য কপি
শ্রীমৎ ভদ্দীয় ভিক্ষু